

চাকমা ভাষারীতি

(ব্যাকরণ)



প্রিয়দর্শী খীসা



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

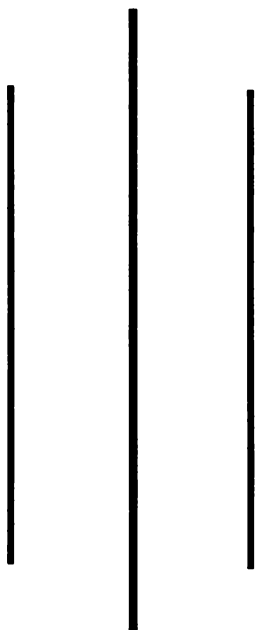
কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠান বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Abhijnanada Bhante

চাকমা ভাষারীতি

(ব্যাকরণ)



প্রিয়দর্শী খীসা

ঢাকমা ভাষারীতি

(ব্যাকরণ)

গ্রন্থকার : প্রিয়দর্শী খীসা

[গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশক : পুষ্পাঞ্জলি খীসা, অন্নালো খীসা
পুষ্পনিলয়, কল্যাণপুর, রাঙামাটি

প্রকাশ কাল : এপ্রিল ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ

কম্পিউটার কম্পোজ : টিপু ঢাকমা, কল্যাণপুর, রাঙামাটি

প্রচ্ছদ : প্রিয়দর্শী খীসা

মুদ্রণে : রাজবন অফসেট প্রেস, রাঙামাটি

মূল্য : ৫০.০০ টাকা

গ্রন্থকারের অন্যান্য বই :

- ১। স্মৃতি (বাংলা কাব্য) প্রকাশকাল
- ২। কবিতাগুচ্ছ (বাংলা কাব্য)- ঐ
- ৩। চাকমা ভাষা সন্দর্শন- ঐ
- ৪। চাকমা ভাষা তত্ত্ব- ঐ
- ৫। চিজিক্কর বই- ১ম পাঠ- ঐ
- ৬। চিজিক্কর বই- ২য় পাঠ- ঐ
- ৭। আলী গাদেয়া মালী ফুল- ঐ
- ৮। শেষ বিকেলের ডায়েরী (বাংলা কাব্য)
- ৯। চাকমাদিগের পূজা পার্বণ
- ১০। নাক্ষাফুল (চাকমা কাব্য)
- ১১। চাকমা ভাষা রীতি (ব্যাকরণ)
- ১২। প্রবন্ধ সম্ভার
- ১৩। লামাহ্-পালাহ্-বারমাস
- ১৪। সন্ধর্ম মণি মঞ্জুষা (চাকমা বর্ণে ও ভাষায়)
- ১৫। বনভাস্তের বাণী সংকলন
- ১৬। এক কোঁচর ছড়া
- ১৭। জবর মজার ছড়া

আমার কথা

মানব সভ্যতার উষালগ্ন বলতে অবশ্যই মানুষের মুখের ভাষার উন্মেষ কালটাকেই একবাক্যে স্বীকার করে নিতে হবে। মানুষের মুখে ভাষার বিকাশ ঘটার সাথে সাথে যখন মানুষ তার মনের অনুভব-অনুভূতি, আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি অন্যের কাছে প্রকাশ করবার উপায় আয়ত্ত করলো, তখনই মানুষ নিজের মনের ভাব অন্যের কাছে বিক্ষিপ্ত ঘটিয়ে অন্যদের প্রভাবিত করবার কৌশলও আয়ত্ত করলো। ফলে নিজের ভাব-অনুভূতি ইত্যাদি অপরে সঞ্চর করে অপরের সহায়তা এবং প্রত্যেক সার্বিক ভালোতে একাত্ম হবার সুযোগও অধিগম করে সমাজবদ্ধ হলো। তার পরে সমাজের সবার চেষ্টা ও উদ্যমে মানুষ গৃহাচারী বন্যজীবন থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে সামাজিক জীবনাদর্শের পত্তন ঘটালো এবং প্রাণিজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে কালক্রমে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার স্তরে উপনীত হয়ে মানুষের আধিপত্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিস্তার ঘটাতে সক্ষম হলো।

যে অনির্বচনীয় জাদুশক্তির পরশে মানুষ আজ ধরার বুকে সার্বভৌম অধীশ্বররূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সে-শক্তির মূল উপাদান হলো তারই ফুসফুস-তাড়িত বাতাসের দ্বারা বাগ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন স্থানে বাঁধাপ্রাপ্ত হবার ফলে সৃষ্ট ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি। এই বাগ্‌যন্ত্রের দ্বারা সৃষ্ট ধ্বনির সমন্বয়ে গঠিত হয় কোনো বস্তু বা ভাবদ্যোতক শব্দ; সে শব্দগুলির যথাবিন্যাসের দ্বারা সংগঠিত হয় মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করবার জন্য একটি পূর্ণ ভাব প্রকাশক বাক্য। এই বাক্যগুলোর সমষ্টিকেই একত্রে বলা হয় ভাষা।

চাকমা ভাষা বাংলায় সন্নিহিত ভাষা আর বাংলা ভাষা থেকে বিভিন্ন বিশিষ্টতায়ুক্ত আলাদা ভাষা হলেও বাংলার মতো চাকমা ভাষাতেও তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি এবং বিভিন্ন দেশি-বিদেশি শব্দের মিলনে মিশ্রশব্দ আছে এবং এখনো ভাষা সম্রাজ্যবাদের আধিপত্য বিস্তারের মহাপ্লাবনের স্রোতে বাংলা ও ইংরেজি শব্দ বন্যার পানির মতো অপ্রতিরোধ্য ও অব্যাহত গতিতে অনুপ্রবিষ্ট হতে চলেছে।

ছোটো-বড়ো প্রত্যেক ভাষাতে একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র ইতিহাস থাকে, যার দীর্ঘ-হ্রস্ব হিসেবে বিদ্যমানতা দেখা যায়। এ রকম ভাষা মণ্ডলের অভ্যন্তরস্থ চাকমা ভাষাও একটি সদস্য ভাষা। যার সম্পূর্ণ আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে, অনন্য ভাষাশৈলী-সম্বলিত প্রধাসিদ্ধ রীতি আছে এবং আছে সম্পূর্ণ পৃথক

সূত্রাশ্রয়ী ধারাক্রম।

কিন্তু অতীব দুঃখজনক হলেও নিরেট সত্য কথাটা হলো এই যে, চাকমা ভাষার উদ্ভব-কালটি আজ আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অজানা। সে আজ আমাদের শুধু রহস্য মাত্র। তাই এবার আসুন আমরা সবাই মিলে সমন্বিত শক্তি দিয়ে চাকমা ভাষার অতীতকে খুঁজে পেতে কাজে নেমে যাই আর একই সাথে এই ভাষাকে বর্তমান এই বিধ্বংসী গতিধারা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে আন্তর্জাতিক ভাষাঙ্গনে তার আসন পেতে দিই এবং নিজেরা ধন্য হই। চাকমা ভাষার সমুদয় দুর্দৈব আর দুর্লভ্য প্রতিবন্ধকতা সমূলে সমুচ্ছেদ করি, তার সৌন্দর্য্য ও সৌকর্য সাধনে নিজেদের উৎসর্গ করি। শুভদিনে শুভক্ষণে শুভযাত্রা শুরু করে দিতে পারলে অনাগত যুগে কোনো এক বিশেষ শুভক্ষণে একটি দিশা পেয়ে যেতে হয়তো সহজ পথের সন্ধান মিলেও যেতে পারে।

যে সমস্ত বিদেশি শব্দ চাকমা ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হয়ে চাকমা ভাষার বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তিত রূপে চাকমা ভাষার অনন্যতায় সুপ্রচলিত থেকে উপস্থিতি প্রমাণ করে যাচ্ছে তাতে ইহা ধরে নিতে কষ্ট হয় না যে, বাংলা এবং বাঙালিদের মতো চাকমা ভাষা এবং চাকমা জাতি কালে কালে যুগে যুগে বাঙালিদের পাশে থেকে ওইসব বিদেশিদের মুখোমুখি হয়েছেন, (অনুপ্রবিষ্ট শব্দগুলিতে ধ্বনিবিকৃতি ঘটেছে। যেমন ইংরেজিতে অফিস, বাংলায় অফিস, চাকমাতে অভিচ তুর্কীতে দারোগা, বাংলায় দারোগা, চাকমাতে দারগা। পুর্তগীজে আনান, বাংলায় আনারস আর চাকমাতে আনাচ ইত্যাদি)।

সকল প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভুলে তাই আসুন আমরা চিন্তনে-মননে সমন্বিত হই; সম্মিলিত মেধা, উদ্যম আর ধীশক্তিসম্পন্ন মানসিকতার মনোবলে আমাদের অভিষ্ট লক্ষ্যের পানে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাই মাতৃভাষার মস্তকোপরি কনক কিরীট পরিয়ে তার জয়গানে মুখর হই, ধন্য হই।

ব্যাকরণ একটি সজীব এবং গতিমান ভাষার সুশৃঙ্খল বিদ্যমানতার জন্য সংবিধি। লেখক, গবেষক, কথক এবং পাঠক সমাজ যাতে স্বেচ্ছাচারিতাকে সর্বতোভাবে পরিহার করে শৃঙ্খলাবদ্ধ আর বিস্তৃত, সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট ভাষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে সসম্মানে গৌরব করে নিজের দায়িত্ব সুসম্পন্ন করতে পারেন তজ্জন্য একটি সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট বিধিমালা হলো ব্যাকরণ। ব্যাকরণ বাদে একটি জীবন্ত ও সচল ভাষা অনেকটা গতিহারা নদীর মতো বদ্ধ জলাশয়ের রূপ নিয়ে শেওলা, কচুরিপানায় পরিপূর্ণ মজা পুকুরের অবস্থা

প্রাপ্ত হতে বাধ্য। যেমনটা আমাদের চাকমা ভাষায় চলতেছে।

আমার মতো অপরিপক্ব আনাড়ির হাতে ব্যাকরণের মতো সুকঠিন আবার অতি জটিল বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে যাওয়াটা ধৃষ্টতার সামিল। তথাপি চাকমা ভাষার বর্তমান স্থলনশীল গতিস্রোতে কিঞ্চিৎ মাত্র প্রতিরোধ করা যেতে পারে, সে চেতনা থেকে একান্ত মনের এই অতি নগণ্য প্রয়াস।

কারণ তাতে আমার এই ধারণা যে, আমার আনাড়ি হাতে আর অনুর্বর মস্তিষ্কের ফসল এই চাকমা ভাষারীতি অনেকটা বিড়ম্বনার মতো উদ্ভূত পরিস্থিতিকে সামাল দেবার প্রয়োজনে ঘেন্নায় সুদক্ষ কৌশলীর উপস্থিতি ঘটিয়ে অদূর বা সুদূর ভবিষ্যৎকালে চাকমা ভাষার ক্রমপর্যায়বাহিক ধারাক্রমানুযায়ী সূত্রবদ্ধ সংবিধি প্রণয়নে অকাতর, নিরবচ্ছিন্ন এবং নির্জলা চেতনায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করবার প্রেরণা যোগাবে আর তাতে আমি আমার অসম্পূর্ণ স্বপ্ন পূরণের বাস্তবতা দেখে পরকালে বসে বিদেহী আত্মায় সন্তুষ্ট হতে পারবো, আত্মপ্রসাদ লাভে সক্ষম হবো।

লেখক, গবেষক, কথক ও পাঠকমণ্ডলীর সমীপে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ যে, কোনো অসঙ্গতি নজরে আসলে সুহানুভূতিশীল হৃদয়ে জানালে পরবর্তীকালে তার সংশোধনের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ রূপ দেবার সুযোগ পাবো। যেকোনো গঠনমূলক পরামর্শ বস্তুনিষ্ঠ সত্য তথ্যভিত্তিক বৈজ্ঞানিক সূত্রানুসারে সর্বান্তকরণে বিবেচনা করা হবে।

বিষয়গুলি বাংলা নামানুসারে রক্ষা করা হয়েছে। নামগুলির (বিষয়গুলির) চাকমাভিত্তিক নামকরণের প্রয়োজন এবং যদি দেবার থাকে তাহলে আমিও সবার সাথে একমত থাকবে।

পরিশেষে সর্বস্তরের পাঠক, গবেষক চাকমা ভাষা সম্বন্ধে জানতে আগ্রহীবৃন্দ (সম্মানিত সুধীমণ্ডলীর কাছে) আমার এই অতি ক্ষুদ্র প্রয়াসের ফসল চাকমা ভাষারীতির সাহায্যে কিঞ্চিৎ মাত্র উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করতে পারবো।

প্রিয়দর্শী খীসা

সূচিপত্র

ভাষা ৯

ব্যাকরণ ১৪

ধ্বনি প্রকরণ ১৮

সন্ধি ২৩

বচন ২৫

লিঙ্গ ২৮

ক্রিয়ামূল বা ধাতু ২৯

প্রত্যয় ৩০

পদ প্রকরণ ৩১

ক্রিয়ার কাল ৩৩

কারক ও বিভক্তি ৩৫

বিভক্তি ৩৮

উপসর্গ ৪০

দ্বিরুক্ত শব্দ ৪২

সংখ্যাবাচক শব্দ ৪৪

বাক্য প্রকরণ ৪৫

ভাষা

মানুষ এমন এক শ্রেণীর প্রাণী, যার রয়েছে বুদ্ধি-বিবেচনা অনুভব-অনুভূতি, আনন্দ-বেদনা ইত্যাদি। তাই তার মনে নিয়ত নানা প্রকার ভাবের উদয় হয়। তা সে অপরের নিকট প্রকাশ করে নিজের উপলব্ধ বিষয়টি অন্যের কাছে সঙ্গর ঘটায়, তাদের প্রভাবিত করে এবং একই সাথে অপরের সহায়তা লাভের সহায়ক পটভূমি তৈরীতে নানাবিধ উপায় সৃষ্টি করে থাকে। এই ভাব প্রকাশের জন্য সে কিছু ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি মুখে উচ্চারণ করে। উচ্চারিত ধ্বনিগুলি একটি সুশৃঙ্খল সংগঠন প্রক্রিয়ায় ভাব বা বস্তু জ্ঞাপক শব্দ তৈরী করা হয়। আবার ওই ভাব বা বস্তুদ্যোতক শব্দগুলিকে আরো একটি সূত্রাশ্রয়ী রীতিতে যথা বিন্যাসের দ্বারা মনের একটি সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশক বাক্য সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। এই বাক্যগুলির একত্র সমাবেশই হলো ভাষা।

সংজ্ঞা মানুষ তার মনের ভাব অন্যের কাছে প্রকাশ করার জন্য প্রস্থাসের দ্বারা ফুসফুস-তাড়িত বাতাস জিহ্বা, কণ্ঠ, মূর্ধা, দাঁত, ওষ্ঠ, তালু, নাক ও স্বরতন্ত্রী ইত্যাদির সাহায্যে যেসব ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি সৃষ্টি করে থাকে তাকে ভাষা বলে।

মনীষীগণের সংজ্ঞা : ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, “মানুষের বাগ্যন্ত্রে উচ্চারিত যেসব ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি ভাব প্রকাশের জন্য উচ্চারিত কৌশলরূপে কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবহৃত হয় সেসব ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে ভাষা বলে”।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লা বলেছেন, “মানুষ যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে তার নাম ভাষা।”

ড. সুকুমার সেন বলেছেন, “মানুষের উচ্চারিত অর্থবোধক, বহুজনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা”।

ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ আবদুল আওয়াল বলেছেন, “ভাষা হচ্ছে মানুষের কণ্ঠ-নিঃসৃত ধ্বনি। এই ধ্বনি অর্থপূর্ণ এবং এর সাহায্যে মানুষ মনের ভাবের আদান-প্রদান করে থাকে। যেহেতু মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, তাই তাকে অন্য মানুষের সাথে ভাব বিনিময় করতে হয়। এই ভাব বিনিময়ের জন্য যেসব সংকেত প্রতীক ব্যবহৃত হয় তা-ই ভাষা”। সে-হিসাবে তিনি ভাষাকে বিশ্লেষণ করে ভাষার চারটি মূল বৈশিষ্ট্যও তুলে ধরেছেন। যথা :

প্রথমত, এ ভাষা কতকগুলি ধ্বনির সমষ্টি।

দ্বিতীয়ত, এ ধ্বনি কণ্ঠ-নিঃসৃত।

তৃতীয়ত, এটি একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যবস্থা।

চতুর্থত, এ ধ্বনিগুলি বস্তু বা ভাবের প্রতীক। এ প্রতীক নির্ধারণের ব্যাপারটি আমরা স্বচ্ছায় মেনে নিয়েছি।

কথায় আছে, যে জাতি যত শিক্ষিত, সে জাতি তত উন্নত। ইহা অনস্বীকার্য যে, জাতীয় আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। তবে মাতৃভাষাই হলো প্রকৃত এবং যথোপযুক্ত শিক্ষা লাভের একমাত্র মাধ্যম। কারণ মাতৃভাষার মাধ্যমেই কেবল খুব সাবলীল ও অতি স্বচ্ছন্দভাবে প্রকাশ করবার ও অনুভব-অনুভূতিকে সুনির্দিষ্ট রূপায়ণে সহজ হয়। একজন মানুষ তার নিজের ভাষায় যে স্বচ্ছন্দ গতিতে মনের ভাব সহজ ও সরলভাবে অপরে প্রকাশে সক্ষম; বিভাষার মাধ্যমে তা কোনোমতেই হয়ে উঠতে পারে না। নিজের ভাষায় কথা বলতে, ধ্বনি সৃষ্টিতে ও উচ্চারণে যে সুললিত প্রকাশশৈলী স্বতঃ কার্যক্ষম হয়, বিভাষায় তা কোনো অবস্থাতেই সম্ভব হয় না। ইহা যথেষ্ট লক্ষ করার বিষয় যে, বিভাষায় কথা বলার সময় উচ্চারণে জিহ্বার আড়ষ্টতা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। যেমন- আমি যতক্ষণ খুব সতর্ক থেকে উচ্চারণ করবো ততক্ষণ হয়তো ছাগলই উচ্চারিত হবে। কিন্তু কথা বলার স্বচ্ছন্দ গতিতে ছাগল অবশ্যই একসময় সাগল হয়ে যাবে অর্থাৎ উচ্চারিত হবে।

আমাদের ভাষা চাকমা ভাষা। এটি একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য-সম্বলিত আলাদা ভাষা। বাংলা ভাষার সাথে কিছু শব্দের অর্থগত সাদৃশ্য থাকলেও এর ভাষারীতিতে ধারাক্রম শব্দবিন্যাসের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, প্রথাসিদ্ধ রীতি সর্বোপরি ব্যাকরণের মৌলিক বিষয়াদিতে একটা স্বাভাবিক বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তা ছাড়া বাংলা ভাষা হতে এটির আলাদা বৈচিত্র্য নিয়ে এর নিজস্ব অনন্য ভাষারীতি বিরাজিত। একটা ছোট্ট উদাহরণের সাহায্যে তার বিচার করতে পারি। যেমন- সাধারণ বর্তমানকালে ধাতুর একবচন ও বহুবচনের রূপ, উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরুষের বেলায় দেখা যায় নিম্নরূপ :

বাংলা ভাষা

একবচন : আমি পড়ি

বহুবচন : আমরা পড়ি

চাকমা ভাষা

একবচন : মুই পড়ং

বহুবচন : আমি পড়ি

একবচন : তুমি পড়

একবচন : তুই পড়ছ

বহুবচন : তোমরা পড়

বহুবচন : তুমি পড়

একবচন : সে পড়ে

একবচন : তে পড়ে

বহুবচন : তাহারা পড়ে

বহুবচন : তারা পড়ন।

উপরিউক্ত উদাহরণে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে, চাকমা ভাষায় পুরুষ ও বচন-ভেদে ক্রিয়ার রূপ পাণ্টে যায়। কিন্তু তা বাংলাতে হয় না।

যদিও পৃথিবীর সব মানুষের ভাষাই বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে। তথাপি একইভাবে উদ্ভূত ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টির অর্থ বিভিন্ন ভাষিক সমাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। আর তাই বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে আলাদা আলাদা ভাষার উদ্ভব ঘটেছে।

দেশ, কাল ও পরিবেশ অনুসারে ভাষার স্বাতন্ত্র্যতা এমনকি পরিবর্তনও হয়ে থাকে। নানা প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে উঠে মানবজাতি নিজের মনোভাবের বিকাশের জন্য নানা জাতীয় বস্তু বা ভাবের প্রতীক হিসাবে নানাবিধ ধ্বনির সাহায্যে শব্দের সৃষ্টি করেছে। মূলত ওইসব শব্দ নির্দিষ্ট পরিবেশে কোনো বস্তু বা ভাবের প্রতীক ছাড়া আর কিছুই নয়। এ কারণে আমরা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন ভাষা দেখতে পাই। সে ভাষাও আবার বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়ে এসেছে। তাই আজকে আমরা যেভাবে যে ভাষায় কথা বলতেছি হাজার বছর আগে নিশ্চয়ই এ ভাষা অন্যভাবে উচ্চারিত হতো বা বলা হতো। যেমন আমাদের চাকমা ভাষার সন্নিহিত ভাষা বাংলাতে আমরা বর্তমানে যে অন্তস্থ ‘য’-এর উচ্চারণ পাচ্ছি প্রাচীনকালে তার উচ্চারণ ছিল য/অ ধ্বনিতে।

চাকমা ভাষার শব্দসম্ভার :

আমি ‘দুটি কথা’ শীর্ষক শিরোনামে আমার মতামত পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি যে, চাকমা ভাষায় বিদেশি শব্দের উপস্থিতিও যথেষ্ট লক্ষ্য করার মতো। তার প্রমাণ নিম্নরূপ :

তৎসম শব্দ : সংস্কৃত ভাষার যে-সমস্ত শব্দ অবিকলভাবে চাকমা ভাষায় অনুপ্রবেশ লাভ করেছে, সেসব শব্দগুলোকে তৎসম শব্দ বলে। যেমন : চন্দ্র, সূর্য, ধর্ম, বৈষ্ণব।

অর্ধ-তৎসম শব্দ : যে-সমস্ত সংস্কৃত শব্দ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতরূপে চাকমা ভাষায় অনুপ্রবেশিত হয়েছে সেসব শব্দগুলিকে অর্ধ-তৎসম শব্দ বলে। যেমন : সংস্কৃতে প্রাণ > প্রাকৃতে পরান > চাকমাতে পরান। যত্ন > যতন > যন্তন।

তদ্ভব শব্দ : চাকমা ভাষায় যেসব শব্দগুলির মূল সংস্কৃত, যেগুলি ভাষার পরিবর্তিত রীতিতে প্রাকৃত ভাষার মাধ্যমে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধিত হয়ে চাকমা ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে সেগুলিকে তদ্ভব শব্দ বলে। যেমন সংস্কৃতে হস্ত > প্রাকৃতে হথ > চাকমাতে হাত (উচ্চারণে আহত); মৎস্য (সংস্কৃত) > প্রাকৃতে মচ্ছ > চাকমাতে মাচ ইত্যাদি।

দেশি শব্দ : চাকমা ভাষায় এদেশের আদিবাসীদের কিছু শব্দ প্রবেশ লাভ করেছে; সেগুলোকেই দেশি শব্দ নামে বলা যেতে পারে। যেমন, কুড়ি (কোল ভাষা), পেট (তামিল ভাষা), চুল (মুন্ডারী ভাষা)। তদ্রূপ আরো কুলা, চুম (বিকৃত), ডাব, ডাঙর (বিকৃত), টিঙি (বিকৃত) ইত্যাদি।

বিদেশি শব্দ ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং বাণিজ্যিক কর্মব্যপদেশ থেকে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর লোক এদেশে এসেছে। তাদের সাথে দীর্ঘকাল থাকার সুবাদে কালে কালে তাদের ভাষার শব্দও অবিকলভাবে বা সামান্য পরিবর্তিত রূপে চাকমা ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হয়ে চাকমা ভাষার বৈশিষ্ট্য ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন :

আরবি (ধর্ম-সংক্রান্ত) : ঈমান, হারাম,

প্রশাসন ও সংস্কৃতি বিষয়ক আদালত, উকিল, ওজর, কানুন, কলম, কিস্তা (বিকৃত), গায়েব, দোয়াত, নগদ, বাকি, ব্যয় ইত্যাদি।

ফারসি (প্রশাসন ও সংস্কৃতি বিষয়ক) কারখানা, চোচশামা (বিকৃত), জবাবদি (বিকৃত), তারিখ, তঝক (বিকৃত), দরবার, দোকান, দস্তক, রসদ কাটোজ ইত্যাদি।

বিবিধ : জানোয়ার, জেদা (বিকৃত), নমুনা, বদমাস, হাঙ্গামা ইত্যাদি।

ইংরেজি শব্দ অনেকটা অবিকল উচ্চারণে ইউনিভার্সিটি, ইউনিয়ন, কলেজ, নোট, পাউডার, পেন্সিল, ব্যাগ, ফুটবল, লাইব্রেরি ইত্যাদি।

কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত উচ্চারণে : অভিচ, আভিৎ, বাবু, হাচপাদাল, বখল, অসিভিল, টোন, হেনমেন, পেন, গলচ ইত্যাদি।

অন্যান্য ইউরোপীয় শব্দ :

পর্তুগীজ আনাচ, পিন, আলমারী, গুদম, চাবি, পাউরুটি, বালতি ইত্যাদি।

ওলন্দাজ : ইস্কাহন (বিকৃত), টিক্যা (বিকৃত), তুরুক (বিকৃত), রুইতন, অহরতন ইত্যাদি।

অপরূপ ভাষার শব্দ; যেমন :

গুজরাটি : হদর, হরতাল

পাঞ্জাবি : চাহিদা, শিঘি (বিকৃত)

তুর্কি : চাগর (বিকৃত), দারুগা (বিকৃত)

চিনা : চা, চিনি

মিয়ানমার (বর্মী) : লুঙ্গী, কাং, স্যাং, থামাংতং, ফ্যাং, লেলে, কারগাহ।

ত্রিপুরা : কক্রেই, কোরোই (বিকৃত)

জাপানি : রিকশা

পাংথো : পুজং, ফাউতুম।

চাকমা ভাষাতেও অনেক মিশ্র শব্দের বিদ্যমানতা দেখা যায়। মিশ্র শব্দ হলো, দেশি এবং বিদেশি শব্দের মিলনে যে শব্দ সংগঠন হয়ে থাকে। সে রকম কিছু শব্দ হলো রাজা, বাদশা (তৎসম + বিদেশি), হাট-বাজার (বাংলা + ফারসি), হেড-মৌলভী (ইংরেজি + ফারসি), হেড পন্ডিত (ইংরেজি + তৎসম), খ্রিষ্টাব্দ (ইংরেজি + তৎসম), ডাক্তারখানা (বিকৃত) (ইংরেজি + ফারসি), পকেটমার (ইংরেজি + বাংলা), চৌহদ্দি (বাংলা + আরবি) ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য : (১) দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দ যা-ই কিছু হোক না কেন বর্তমানে চাকমা ভাষায় তার নিজস্ব আঙ্গিকে ব্যবহৃত সব শব্দই চাকমা ভাষার সম্পদ হিসেবে পরিগণিত। শব্দটি কোথা হতে কীভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে সেটি প্রধান বিবেচনা হতে পারে না, বরং বিচারযোগ্য এই যে, অনুপ্রবিষ্ট শব্দটি চাকমা ভাষায় আত্মীকৃত হবার পর পরবর্তীকালে চাকমা ভাষার বৈশিষ্ট্যে তার স্বরূপ গড়ে নিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে ভাষার দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেটাই হলো মূল বিবেচনার বিষয়। কারণ, এসব শব্দ বর্তমানে চাকমা ভাষার সাথে এমনভাবে মিশে গেছে যে, এগুলিকে এখন চাকমা ভাষা হতে আলাদা করে চিন্তাও করা যায় না। সে রকম কয়েকটি শব্দ যেমন- রেডিও, টেলিভিশন, হাচপাদাল, আনাচ, দারুগা, আহগিম, আদালত, বাগি ইত্যাদি।

(২) বাংলাতে যেমন তুচ্ছার্থে ও সম্ভ্রমার্থে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ব্যবহার আছে, চাকমা ভাষাতেও সে-রকম ব্যবহার আছে। তবে বাংলাতে মধ্যম ও প্রথম বানান পুরুষের সর্বনাম পদটি বদলে যায় এবং ক্রিয়ার শেষে 'ন' যুক্ত হয়। আর চাকমাতে মধ্যম ও নাম-পুরুষে সর্বনাম পদের বহুবচন হয় এবং সেই অনুযায়ী ক্রিয়াপদেও বহুবচনের রূপ হয়ে থাকে।

ব্যাকরণ

ব্যাকরণ যে শাস্ত্র জানা থাকলে ভাষা শুদ্ধ করে লিখতে, পড়তে ও বলতে পারা যায়, তাকে ব্যাকরণ বলে।

চাকমা ভাষার ব্যাকরণ : যে পুস্তক পাঠ করলে চাকমা ভাষান্তর্গত ধ্বনি, বর্ণ, অক্ষর, শব্দ ও বাক্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়, অর্থাৎ ধ্বনির সৃষ্টির স্থানভিত্তিক তার শুদ্ধ উচ্চারণ; ধ্বনি বা বর্ণসমষ্টির সমন্বয়ে গঠিত অর্থবোধক বা অর্থহীন শব্দাংশ বা অক্ষর, অর্থদ্যোতক শব্দ গঠন এবং সে অর্থজ্ঞাপক শব্দগুলির সমন্বয়ে সংগঠিত মনের সম্পূর্ণভাব প্রকাশক বাক্য এবং শব্দগুলির প্রায়োগিক বিধানাদি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় তাকে চাকমা ভাষার ব্যাকরণ বলে।

ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাকরণ পাঠ করলে ভাষার অন্তর্গত তার অভ্যন্তরীণ প্রথাসিদ্ধ নানাবিধ উপাদান ও তাদের গঠন প্রকৃতি এবং সূত্রবদ্ধ ধারাক্রমানুযায়ী সার্থক ব্যবহারোপযোগিতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় এবং তাতে লেখা, বলা ও উচ্চারণে শুদ্ধ, অশুদ্ধ নিরূপণ করে ভ্রান্তিটাকে পরিহার করা যায়। ব্যাকরণে প্রধান আলোচ্য বিষয় :

- (১) ধ্বনিতত্ত্ব (Phonetics)
- (২) ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonology)
- (৩) শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব (Morphology)
- (৪) পদক্রম বা বাক্যতত্ত্ব (Syntax)
- (৫) অর্থতত্ত্ব (Semantics)

এগুলি ব্যতীত অভিধান তত্ত্ব (lexicography) ছন্দ (Prosody) ইত্যাদিও ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত। ব্যাকরণের উপরোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে ধ্বনিবিজ্ঞান এবং ধ্বনিতত্ত্ব দুটি একই বিষয়ের এপিট-ওপিট তুল্য। এ দুটি বর্ণনাভিত্তিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রথম দুই স্তর হিসাবে পরবর্তী স্তরগুলোর ভিত্তি তৈরি করে থাকে। বিশ্বখ্যাত ধ্বনিবিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেব এ দুটি বিষয় সম্পর্কে বলেছেন, “ধ্বনিবিজ্ঞান এবং ধ্বনিতত্ত্ব এর মধ্যে কোথায় মিল এবং কোথায় গড়মিল রয়েছে এখানে সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি। ব্যাপক অর্থে ধ্বনিবিজ্ঞান এবং ধ্বনিতত্ত্বের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই—বিভিন্ন নামে

একই বিষয়ের তারা এপিট-ওপিট মাত্র। কিন্তু সূক্ষ্মতর অর্থে তাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে বাকপ্রত্যঙ্গ থেকে শুরু করে ধ্বনির গঠন ও শ্রুতি-বিষয়ক যাবতীয় বর্ণনাই সংকীর্ণতার অর্থে Phonetics এর বিষয়ভুক্ত। অর্থাৎ ধ্বনির গঠন, উচ্চারণ ঘটিত বর্ণনা, ধ্বনির শ্রুতি এবং ধ্বনির শুদ্ধ-অশুদ্ধ উচ্চারণ সম্পর্কে তথ্য উদ্ঘাটন এ বিজ্ঞানের প্রাথমিক কাজ। সেজন্য ভাষার ধ্বনিদেহের প্রাথমিক সোপান নির্ণয়ের ব্যাপারটিও Phonetics এর অন্তর্ভুক্ত। এর সাহায্যে ভাষার ধ্বনি সমষ্টির উচ্চারণ পরীক্ষা করে উক্ত ভাষার স্বতন্ত্র অর্থবোধক বিভিন্ন ধ্বনিমূলের আবিষ্কার এবং সেগুলোর অবস্থান (Distribution) ও যাবতীয় ব্যবস্থা ধ্বনিবিজ্ঞানের পরবর্তী পর্যায় ধ্বনিতত্ত্বের আওতাভুক্ত বলা যেতে পারে।

(১) ধ্বনিতত্ত্ব : যে সমস্ত ন্যূনতম ধ্বনি পার্থক্যের জন্য একাধিক শব্দের মধ্যে অর্থের পার্থক্য হয় সেই ধ্বনিগুলোকে ধ্বনিমূল বা মূলধ্বনি (phoneque) বলে। যেমন : ‘তাল’ এবং ‘পাল’ দুটি শব্দ। তাল শব্দের ‘ত’ এবং পাল শব্দের ‘প’ এর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে সে পার্থক্যের জন্যই শব্দ দুটো আলাদা হয়ে গেছে। তাদের অর্থও আলাদা। শব্দ দুটিতে ‘ত’ ও ‘প’ ছাড়া ধ্বনির ক্ষেত্রে আর কোনো পার্থক্য নেই। এই ‘ত’ ও ‘প’ এর জন্য শব্দ দুটিতে অর্থের পার্থক্য হয়েছে। কাজেই ‘ত’ ও ‘প’ হলো বাংলা ভাষার মূল ধ্বনি।

ধ্বনিমূল কোনো নির্দিষ্ট ধ্বনি নয়, বরং কতকগুলো ধ্বনির সমষ্টি। যেমন ‘কল’ এর ‘ক’; কাল, কিল, কুল-এর ক-ও পরস্পর বিভিন্ন ধ্বনিমূল এমন কতকগুলো ধ্বনির সমষ্টি; যা ক) ধ্বনিগতভাবে একই ধরনের এবং যার খ) নির্দিষ্ট ভাষার বা উপভাষার মধ্যে বিন্যাসগত ঐক্য আছে।

ধ্বনিবিজ্ঞানী গ্লিসন বলেছেন, যে ধ্বনিমূল হলো বৈপরীত্যসূচক একই শ্রেণীগত ধ্বনি একক যা পরিবেশ ও অবস্থান ভেদে বিভিন্ন এবং এই বিভিন্ন ধ্বনিরূপগুলো পরিপূরক পরিবেশজাত। এই পরিবেশজাত সহধ্বনিগুলো একই ধ্বনিমূলের সদস্য। উচ্চারণ হিসেবে ধরা যায় বাংলার দন্ত্য ‘ন’ মূর্ধন্য ‘ণ’ এবং ‘ঞ’ কে। এই তিনটি পরিপূরক পরিবেশে অবস্থিত। এখন ব্যাপকতর পরিবেশে এদের অবস্থানের স্বরূপ দেখা যাক।

দন্ত্য ‘ন’ ‘ত’ বর্গীয় ধ্বনির আগে ছাড়া ব্যবহৃত হয় না। মূর্ধন্য ‘ণ’ ‘ট’ বর্গীয় ধ্বনি ছাড়া ব্যবহৃত হয় না; আবার ‘ন’ কখনও ‘ণ’-এর পরিবেশে এবং ‘ঞ’ কখনো ‘ন’ কিংবা ‘ণ’-এর পরিবেশে ঠাই পায় না। সুতরাং বলা যায় যে, ‘ন’ ‘ণ’ এবং ‘ঞ’ একই ধ্বনিমূলের সহধ্বনি। এদের ধ্বনিমূল

দন্তমূলীয় 'ন'। সূত্র : ভাষা সন্দর্শন, পৃ. ৯৩।

বর্ণ : মানুষের দ্বারা সৃষ্ট ধ্বনির জন্য বা ধ্বনির চক্ষুগ্রাহ্য রূপ বা প্রতীক বা ধ্বনির দৃশ্যরূপকে বর্ণ বলে। ভাষা মাঝেই ধ্বনির চিহ্ন বা ধ্বনি নির্দেশক প্রতীক থাকে। একটি ভাষার সকল বর্ণগুলিকে একত্রে বর্ণমালা বলে। ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনি বা বর্ণের উচ্চারণ-প্রণালি, উচ্চারণের স্থান, ধ্বনির শ্রেণী, ধ্বনি বিচার, ধ্বনি বা তার প্রতীক বর্ণের বিন্যাস প্রণালি, ধ্বনি সংযোগ বা সন্ধি, ধ্বনি পরিবর্তন ইত্যাদি আলোচনা করা হয়।

(২) শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি দ্বারা কোনো বস্তু বা ভাবের অর্থজ্ঞাপক ধ্বনি সমন্বয়কে শব্দ বলে। শব্দের ক্ষুদ্রাংশকে বলে রূপ (Morpheme)। রূপ গঠন করে শব্দ। জীববিজ্ঞানে Morphology (অঙ্গসংস্থান বিজ্ঞান) অর্থাৎ উদ্ভিদ বা জন্তুর আকার ও দেহ গঠন সম্পর্কীয় বিজ্ঞান) বা রূপতত্ত্বে যেমন জৈববস্তুর বিভিন্ন রূপ বা গঠন বর্ণনা-বিশ্লেষণ ইত্যাদি, ভাষাতত্ত্বেও তদ্রূপ রূপতত্ত্বের বা শব্দতত্ত্বে কাজ হলো শব্দের সংগঠন বা গঠন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ-বর্ণনা। সেজন্য ভাষাতত্ত্বে শব্দতত্ত্বকে রূপতত্ত্বও বলা হয়। কারণ শব্দ হলো বস্তু বা ভাবের অর্থজ্ঞাপক চিহ্ন শব্দের দ্বারা আমরা কোনো পরিচিত বস্তুকে অথবা মনের ভাবের অবস্থাকে প্রকাশ করতে চাই, তজ্জন্য একটি বাক্যের অন্তর্গত শব্দ, তার উৎস বা উৎপত্তির বিবরণ বিশ্লেষণ ইত্যাদি শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্বের আওতায় পড়ে।

(৩) বাক্যতত্ত্ব : যে সবিন্যস্ত পদসমষ্টির সাহায্যে মনের ভাব পরিষ্কার ও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে তাকে বাক্য বলে। একটি সার্থক বাক্যের গঠন প্রক্রিয়া, বাক্যান্তর্গত নানা রকমের উপাদানসমূহের সংযোগ সাধন ও ক্রমবিকাশ, যথার্থ ব্যবহারোপযোগিতা নির্ধারণ বাক্যের অভ্যন্তরস্থ পদ বা শব্দগুলির স্থান নির্ণয় এবং পদ সমষ্টির রূপ পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়গুলির আলোচনা বাক্যতত্ত্বের আওতায় থাকে। সবিশেষ এই যে, বাক্যতত্ত্বে মূলত বাক্যে পদবিন্যাস সম্পর্কিত আলোচনা পর্যালোচনা করা হয় বলে বাক্যকে পদক্রমও বলা হয়।

(৪) অর্থতত্ত্ব : শব্দ ও বাক্যের অর্থ বিচার অর্থাৎ নানা প্রকারভেদ সম্বন্ধে অর্থাৎ মূখ্যার্থ, গৌণার্থ, বিপরীতার্থ ইত্যাদি বিষয়বিশেষের আলোচনা অর্থতত্ত্বে করা হয়ে থাকে।

ব্যাকরণের সহজ আলোচনার সুবিধার জন্য আরো অতিরিক্ত কতিপয় শব্দের ব্যবহার করা হয়, যেগুলোকে পারিভাষিক শব্দ বলে সেগুলিও শব্দতত্ত্বের আওতায় থাকে। যথা :

(ক) সাধিত শব্দ : মৌলিক শব্দ বাদে বাক্যে অন্তর্গত অন্য সকল শব্দকে সাধিত শব্দ বলে। যেমন- গড়মিল। ইহা আবার দুই প্রকার। যথা- নাম বা শব্দ ও ক্রিয়া।

(গ) প্রকৃতি : যে শব্দ বা শব্দের যে অংশকে আর কোনো ক্ষুদ্রতম অংশে বিভাজিত করা যায় না তাকে প্রকৃতি (স্বভাব, স্বাভাবিক গুণাগুণ, সৃষ্টির মূল বা আদি কারণ) বলে। প্রকৃতি দুই প্রকার। যথা নাম প্রকৃতি ও ক্রিয়া প্রকৃতি বা ধাতু।

(ঘ) প্রত্যয় : শব্দ গঠনের জন্য শব্দ বা নাম প্রকৃতির আর ক্রিয়া প্রকৃতির পরে বা ধাতুর উত্তর যে শব্দাংশ যুক্ত হয়ে থাকে, তাকে প্রত্যয় বলে।

(ঙ) উপসর্গ : যে শব্দ ধাতুর পূর্বে কিছু কিছু অব্যয়সূচক শব্দাংশ সংযুক্ত হয়ে সাধিত শব্দের অর্থের পরিবর্তন, সম্প্রসারণ ও সংকোচন ঘটিয়ে থাকে এগুলোকে উপসর্গ বলে। যথা- অ-সিভিল, কু-খাস্যেক ইত্যাদি।

ধ্বনি প্রকরণ

ধ্বনির আওতাধীন অর্থাৎ তার পরিবেষ্টনীতে কী কী আলোচনা করা হয় সে-সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতিমূলক আলোচনা আমি ভাষা পরিচ্ছেদে করে এসেছি।

তাই এখানে শুধু ধ্বনির শ্রেণীকরণ ও ধ্বনিবিচার বিষয়ক আলোচনা মাত্র করা হবে। ধ্বনি অর্থাৎ বিশেষত বাগ্‌ধ্বনি দুইভাগে বিভক্ত। স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি।

(১) স্বরধ্বনি (গায় মাত্যা) যে ধ্বনি নিজেই স্বয়ম্ভু হয়ে স্বাধীনভাবে উচ্চারিত হতে পারে তাকে স্বরধ্বনি বলে। যথা : অ, আ, ই, উ, এ, ঐ, ও ইত্যাদি। স্বরধ্বনি আবার দুইভাগে বিভক্ত। যথা মৌলিক স্বরধ্বনি এবং যৌগিক স্বরধ্বনি।

ক) মৌলিক স্বরধ্বনি : যে স্বরধ্বনিকে আর ভাঙা যায় না বা ব্যবচ্ছেদ করা যায় না তাকে মৌলিক স্বরধ্বনি বলে। যথা অ, আ, ই, উ, এ, ও ইত্যাদি।

খ) যৌগিক বা দ্বি-স্বরধ্বনি পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি একটি স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ের মধ্যেই উচ্চারিত হয়ে থাকে, তাকে বা সে মিশ্র স্বরধ্বনিকে যৌগিক বা দ্বি-স্বরধ্বনি বলে। যথা : ঐ, ও ইত্যাদি।

(২) ব্যঞ্জনধ্বনি (বলে মাত্যা ধ্বনি) যে ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া নিজে উচ্চারিত হতে পারে না তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। যেমন : কা, কি, কু, কে ইত্যাদি।

বর্ণ : ধ্বনির প্রতীক বা ধ্বনির চক্ষুগ্রাহ্য রূপ বা ধ্বনি নির্দেশক চিত্রকে বর্ণ বলে। বর্ণকে আবার ধ্বনির স্থায়ী প্রতিনিধি বা ধ্বনির দৃষ্টিগোচরীভূত রূপ বা আকৃতিও বলা চলে। কারণ ধ্বনি কানে শুনা যায়, কিন্তু চোখে দেখা যায় না। বর্ণ চোখে দেখা যায়।

ধ্বনি বা বর্ণ দুইভাগে বিভক্ত। যথা : স্বরধ্বনি বা বর্ণ; যথা- অ + ই এবং ব্যঞ্জনধ্বনি বা বর্ণ। যথা- কা, পা ইত্যাদি। সকল বর্ণগুলিকে একত্রে বলে বর্ণমালা।

দ্রষ্টব্য : উচ্চারণে সুবিধার জন্য চাকমা ব্যঞ্জনবর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি 'আ' স্বরধ্বনি যুক্ত করে উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। স্বরধ্বনি যুক্ত না হলে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারিত হতে পারে না, স্বরধ্বনিবর্জিত ব্যঞ্জনধ্বনিতে

(ব্যঞ্জনবর্ণে) মায্যা চিহ্ন দিয়ে লেখা হয়।

স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ যথাক্রমে স্বরকার এবং ফলা হলো তাদের ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত রূপ। সকল স্বরবর্ণ এবং কিছু ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহারে দুটি রূপ আছে। তার একটি পরিপূর্ণ-রূপ বা অবিকল-রূপ এবং অপরটি হলো সংক্ষিপ্ত-রূপ। স্বরবর্ণ যখন স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় তখন তার যে রূপ তা তার পরিপূর্ণ-রূপ আর যখন সংক্ষিপ্তরূপে অন্য ব্যঞ্জনের ধ্বনি প্রকাশে ব্যবহৃত হয়, তখন হলো তার সংক্ষিপ্ত-রূপ। যথা- ‘আ’ ‘া’ কার, ই- িকার ইত্যাদি। তদ্রূপ ব্যঞ্জন বর্ণেও কিছু বর্ণের দুটি রূপ আছে। বিশেষত জিল্যা ‘যা’ এবং দ্বিদাজ্যা ‘রা’ ইত্যাদি। যথা- যা-ফলা ও রা-ফলা হলো তাদের সংক্ষিপ্ত-রূপ আর একাকী ব্যবহৃত হলে পূর্ণ-রূপ।

বাংলাতে একটা ‘কার’ এর ব্যবহার আছে যেটি চাকমাতে নেই। সেটি হলো ‘ঋ’ কার। তজ্জন্য ঋ কার দ্বারা উচ্চারিত চাকমা শব্দগুলি রা-ফলা যোগে লিখিত হয়ে থাকে।

ব্যঞ্জনধ্বনি বা বর্ণ (বলে মাত্যা বর্ণ) ধ্বনি সৃষ্টির জন্য মুখবিবরে মূল উচ্চারণক হলো জিহ্বা ও ওষ্ঠ। উচ্চারণের স্থান হলো কণ্ঠ বা জিহ্বামূল, তালু বা অগ্রতালুজাত, মূর্ধ্য বা পশ্চাদন্তমূলীয়, দন্ত বা অগ্রদন্তমূলীয় এবং ওষ্ঠ।

চাকমা বর্ণমালায় বলেমাত্যা বর্ণের ‘কা’ থেকে ‘মা’ পর্যন্ত পঁচিশটি বর্ণ বাংলার মতো স্পর্শ বর্ণ। এগুলি উচ্চারণে কোনো-না-কোনো স্থান স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়। স্পর্শের স্থান হিসাবে বর্ণীয় বর্ণগুলিকে পাঁচটি বর্ণে ভাগ করা যায়। যথা : কা, চা, টা, তা ও পা বর্ণ। তবে লক্ষ করার বিষয় হলো চাকমা ভাষার মধ্যে উচ্চারণে ‘টা’ বর্ণ ও ‘তা’ বর্ণের মধ্যে তেমন ‘সুস্পষ্ট’ কোনোরূপ পার্থক্য দেখা যায় না। যেমন : তালি, টালি, গন-গণগন্যা, মণ-মন, থাল, ঠাওর ইত্যাদি।

কা বর্ণ এই বর্ণের পাঁচটি বর্ণ হলো কা হতে ঙা পর্যন্ত। এগুলির উচ্চারণস্থান হলো জিহ্বার গোড়ার দিকে নরম তালুর পশ্চাৎভাগ। তজ্জন্য এগুলি জিহ্বামূলীয় বা কণ্ঠধ্বনি।

চা-বর্ণ : ‘চা’ বর্ণ হতে ‘ঞা’ বর্ণ পর্যন্ত পাঁচটি বর্ণের উচ্চারণ স্থান হলো জিহ্বার অগ্রভাগ চ্যাপটাভাবে তালুর সম্মুখভাগের সঙ্গে ঘর্ষণ লাগিয়ে। তজ্জন্য এগুলিকে তালব্য স্পর্শধ্বনি বলা যায়।

টা-বর্ণী : টা হতে ণা পর্যন্ত এই পাঁচটি বর্ণের উচ্চারণ স্থান হলো জিহ্বার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ উন্টিয়ে উপরের মাড়ির গোড়ার শক্ত অংশকে (মূর্ধা) স্পর্শ করে। এগুলোর উচ্চারণে জিহ্বা উন্টিয়ে যায় বলে দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত

ধ্বনি বলা হয়। আবার উপরের মাড়ির গোড়ার শক্ত অংশ অর্থাৎ মূর্ধা স্পর্শ করে উচ্চারিত হয় বলে মূর্ধন্য ধ্বনিও বলা হয়। বস্তুতপক্ষে চাকমা ভাষায় 'টা' বর্গীয় ধ্বনিগুলির উচ্চারণের শ্রুতিতে নেই।

তা-বর্গী 'তা' হতে 'না' পর্যন্ত এই পাঁচটি ধ্বনির উচ্চারণের স্থান হলো জিহ্বার সামনের দিকে প্রসারিত হয়ে অগ্রভাগ উপরের দাঁতের গোড়ার দিক স্পর্শ করে। তজ্জন্য এই পাঁচটি ধ্বনিকে বা বর্ণকে দন্ত্যধ্বনি বা বর্ণ বলা হয়।

পা-বর্গ 'পা' হতে 'মা' পর্যন্ত পাঁচটি ধ্বনি উচ্চারণে ওষ্ঠের সাথে অধরের স্পর্শ ঘটে থাকে। তজ্জন্য এগুলিকে ওষ্ঠ্যধ্বনি বা বর্ণ বলে।

দ্রষ্টব্য : (ক) পাঁচটি বর্ণের প্রত্যেক পঞ্চম বর্ণটি; যথা : ঙা, ঞা, গা, না, এবং মা-ধ্বনি বা বর্ণগুলির দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণে নাক ও মুখ দিয়ে কিংবা কেবলমাত্র নাক দিয়ে ফুসফুস-তাড়িত বাতাস বেড়িয়ে যায় বলে এই ধ্বনিগুলিকে নাসিক্য ধ্বনি এবং প্রতীকী বর্ণগুলিকে নাসিক্য বর্ণ বলে।

০ (একফুদ), (দ্বি-ফুদ) আহ * (চানফুদ) তিনটি স্বাধীনভাবে অন্য বর্ণের মতো ব্যবহৃত হতে পারে না বা ধ্বনি সৃষ্টি করতে পারে না। অন্য বর্ণের আশ্রয়ে তাদের ধ্বনি দ্যোতিত হয়ে থাকে বলে এই তিনটিকে পরাশ্রয়ী বর্ণ বলা হয়। শব্দের আদিতে বসে শব্দও গঠন করতে পারে না।

কা-বর্গীয় ধ্বনি:- কা, খা, গা, ঘা, ঙা এ পাঁচটি বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ জিহ্বার গোড়ার দিকে নবম তালুর সম্মুখভাগের সঙ্গে ঘর্ষন লাগে। তাই এগুলিকে তালব্য স্পর্শ ধ্বনি বলা হয়।

(খ) চানফুদ চিহ্ন বা প্রতীকটি পরবর্তী স্বরধ্বনির অনুনাসিক্যের দ্যোতনা করে। তাই এটিকে অনুনাসিক্যধ্বনি এবং বর্ণকে অনুনাসিক্য বর্ণ বলে। যেমন- পুঁত, পেঁত ইত্যাদি।

(গ) চাকমাতে চিলামুঙা এবং একফুদ বর্ণ দুটির দ্যোতিত ধ্বনিতে ধ্বনিগত কোনো পার্থক্য নেই। দুটি ধ্বনিই অভিন্ন। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে শুধু চিলামুঙা-তে স্বরকারাদি যুক্ত করে ধ্বনির পরিবর্তন সাধন করা যায়। কিন্তু একফুদ-তে তা পারা যায় না। বরং স্বভাবতই সেটি সব সময় অন্য বর্ণের আশ্রয়ে ধ্বনিত বা উচ্চারিত হতে পারে। যথা : টেঙা, লেঙী, শিঙা, ঢেঙা ইত্যাদি।

(ঘ) ঞা ধ্বনির দ্যোতিত ধ্বনি নাসিক্য ইয়া'র অনুরূপ। যেমন- মিঞা। এটি চা-বর্গীয় ধ্বনির আগে প্রযুক্ত হলে তার উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য অবিকল থাকে। যথা : খঞ্জন, ঢেঞ্জাং ইত্যাদি।

(ঙ) চাকমা ভাষাতে গা ও না-বর্গীয় ধ্বনিগুলির উচ্চারণে দ্যোতিত ধ্বনিতে কোনো পার্থক্য নেই। যথা : মনা, গণা ইত্যাদি।

(চ) ঙা, একফুদ, ঞা এবং গা চারটি ধ্বনি কখনো শব্দের আগে বসে শব্দ গঠন করতে পারে না।

অল্পপ্রাণ বর্ণ : বর্গীয় প্রত্যেক প্রথম ও তৃতীয় বর্ণগুলির উচ্চারণকালীন ফুসফুস থেকে বাহিরে আগমনকারী বাতাস স্বাভাবিক থাকে তাই উচ্চারণও হালকা থাকে। তজ্জন্য এগুলোকে অল্পপ্রাণ বর্ণ বা ধ্বনি বলা হয়। যথা : কা, গা ইত্যাদি।

মহাপ্রাণ বর্ণ : বর্গীয় প্রত্যেক দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বর্ণগুলি উচ্চারণে বহির্গমনমুখী বাতাসের চাপ বেশি থাকে বলে উচ্চারণে তীব্রতা থাকে। সেই জন্য এগুলোকে মহাপ্রাণ বর্ণ বা ধ্বনি বলা হয়। যথা : খা, ঘা ইত্যাদি।

অঘোষ ধ্বনি : যে সমস্ত ধ্বনি বা বর্ণ উচ্চারণকালীন স্বরতন্ত্রী অনুরণন থাকে না বা অনুরণিত (ধ্বনির অনুবর্তী ক্রম বিলীয়মান ধ্বনিসমূহ) হয় না তাকে অঘোষ বর্ণ বা ধ্বনি বলে। যথা : কা, খা ইত্যাদি।

ঘোষ বর্ণ : যে সমস্ত ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় তাদেরকে ঘোষ ধ্বনি বলে। যথা : গা, ঘা ইত্যাদি।

অস্তস্থ বর্ণ : যে সব বর্ণের ধ্বনি উচ্চারণে স্পর্শ ও উন্ম ধ্বনির মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে তাদেরকে অস্তস্থ বর্ণ বা ধ্বনি বলে। যথা : জিল্যা যা, বাজন্যা ওয়া।

রা বর্ণ : এই বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বার অগ্রভাগকে কম্পিত করে এবং তা দ্বারা দন্তমূলকে একাধিকবার দ্রুত আঘাত করে। এ জন্য এটিকে কম্পনজাত ধ্বনি এবং বর্ণকে কম্পনজাত বর্ণ বলে।

লা বর্ণ : এই বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বার অগ্রভাগকে মুখের মাঝামাঝি দন্তমূলে ঠেকিয়ে রেখে জিহ্বার এক বা দু-পাশ দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যায়। জিহ্বার পাশ দিয়ে বায়ু নিঃসৃত হয় বলে একে পার্শ্বিক ধ্বনি এবং বর্ণকে পার্শ্বিক বর্ণ বলে।

বাজন্যা ওয়া এবং চেময্যা ইয়া বর্ণ : বর্ণ দুটি অর্ধস্বর। প্রথমটি অয় বা ওয়া এবং দ্বিতীয়টি অয়া বা ইয়া।

উন্মধ্বনি : যে সমস্ত ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারণে বাগ্ বা মুখবিবরে খুব কম বাধা পেয়ে কেবল ঘর্ষণপ্রাপ্ত হয়ে থাকে অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত বেশি ঘর্ষণ খেয়ে বের হয় এবং শিষের মতন ধ্বনির উৎপাদন হয়ে থাকে তাকে শিষ বা উন্মধ্বনি এবং বর্ণকে শিষ বা উন্ম বর্ণ বলে। যথা : সা।

হা বর্ণ এই বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনিটি কণ্ঠনালীতে উৎপন্ন মূল উম্ম ঘোষধ্বনি। এ উম্মধ্বনিটি উচ্চারণের সময় উন্মুক্ত পথের মধ্য দিয়ে বাতাস জোরে নির্গত হয়। এ ধ্বনির উচ্চারণে দ্যোতিত ধ্বনি সম্পর্কে ড. হাই সাহেব বলেছেন, “হ” গলনালীর স্বরযন্ত্র থেকেই উচ্চারিত হয় বলে উচ্চারণে স্বরতন্ত্রী দুটো রীতিমতো কেঁপে যায়। বাংলায় আমরা যে ‘হ’-এর সাথে পরিচিত হই তা মহাপ্রাণ ঘোষধ্বনিই”। আবার ঘোষতা সম্পর্কে বলেছেন, “মুখবিবর ও ঠোঁটের যেকোনো যায়গায় ধ্বনি গঠনকালে স্বরযন্ত্রের কাঁপুনি অক্ষুন্ন থাকলে সেসব ধ্বনির অন্যান্য গুণের সঙ্গে ঘোষতা গুণ মূর্ত হয়ে ওঠে”। (সূত্র : পৃ. ৮৬, ৮৭)

ঃ (দ্বি-ফুদ) এটি বাংলায় অঘোষ হ এর উচ্চারণে প্রাপ্ত ধ্বনি। বস্তুত চাকমাতে এটি সচরাচর ব্যবহার দেখা যায় না।

দ্রষ্টব্য ব্যঞ্জনধ্বনির একটি ধ্বনি ওয়া। ধ্বনিটি দ্বিস্বরধ্বনি। যথা ও+আ। এটির উচ্চারণে ‘অয়া’ বা ‘ওয়া’ শ্রুতি পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ধ্বনিটি বাংলার অন্তস্থ ‘ব’ এর প্রতিভূ। তাই বর্ণটিকে এবং তাকে নিয়ে যে ‘ও’কারের ব্যবহার পদ্ধতি সে সম্পর্কে সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের দরকার আছে বলে মনে করি।

সন্ধি

সংজ্ঞা : পাশাপাশি দুটি শব্দের মিলনের নাম হলো সন্ধি। যথা : ভিক্ষা + অন্ন = ভিক্ষান্ন।

সন্ধির উদ্দেশ্য হলো স্বাভাবিক উচ্চারণে সহজ প্রবণতা বা বোঁক বিশিষ্টতা অর্থাৎ প্রবৃত্তিবিশেষ এবং শব্দের ধ্বনিগত মাধুর্য সৃষ্টি করা। সন্ধি নতুন শব্দ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। যে নিয়মের ভিত্তিতে সন্ধি সৃষ্টি হয় তাকে সূত্র বলা হয়।

সন্ধি প্রধানত দুই প্রকার। যথা : স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি।

স্বরসন্ধি : পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনির মিলনের নাম স্বরসন্ধি। যথা : হিংসা + উক = হিংসুক। এখানে দেখা যাচ্ছে হিংসা + উক এর হিংসা-তে 'আ' এবং উক এর 'উ' এর মিলনে 'আ' ধ্বনির লোপ হয়েছে।

স্বরসন্ধির নিয়ম : (১) অ-কার অথবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয়ের মিলনে 'আ' হয়। যথা নর + অধম = নরাধম, কারা + আগার = কারাগার।

(২) অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই-কার থাকলে উভয়ে মিলে এ-কার হয়। এ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা : শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা।

(৩) অ-কার কিংবা আ-কারের পর উ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ও-কার হয়। ও-কার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা : সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়, মহা + উৎসব = মহোৎসব ইত্যাদি।

(৪) অ-কার কিংবা আ-কারের পর এ-কার কিংবা ঐ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঐ-কার হয়। ঐ-কার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা : জন + এক = জনৈক, মত + ঐক্য = মতৈক্য ইত্যাদি।

(৫) অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও-কার কিংবা ঔ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঔ-কার হয়, ঔ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা : বন + ঔষধ = বনৌষধ, মহা + ঔষধ = মহৌষধ ইত্যাদি।

(৬) ই-কারের পরে ই-কার ব্যতীত অন্য বর্ণ থাকলে তাহলে ই-এর পরিবর্তে 'য' হয় এবং অন্তস্থ 'য'টি য-ফলা হয়ে পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা : অতি + অন্ত = অত্যন্ত, অতি + আচার = অত্যাচার, প্রতি + এক = প্রত্যেক, অতি + উক্তি = অতুক্তি।

(৭) উ-কারের পর উ-ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ থাকলে উ-কার এর পরিবর্তে

‘ব’ হয় এবং ‘ব’ পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা : সু + অল্প = স্বল্প, সু + আগত = স্বাগত।

ব্যঞ্জন সন্ধি স্বরে ব্যঞ্জনে এবং ব্যঞ্জনে-ব্যঞ্জনে মিলনে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে।

নিয়মাবলী :

(১) স্বরধ্বনির পর ছ থাকলে ছ-এর স্থলে চ্ছ হয়। যথা : মুখ + ছবি = মুখচ্ছবি।

(২) স্বরবর্ণ পরে থাকলে প্রথম বর্ণের স্থলে তৃতীয় বর্ণ হয়। যথা : অসৎ + উপায় = অসদুপায়।

(৩) চ অথবা জ এর পরে ‘না’ থাকলে ‘না’ এর পরিবর্তে জ্জ হয়। যথা : যজ + ন = যজ্জ।

(৪) তা অথবা দা এর পরে চা কিংবা ছা থাকলে তদস্থলে চ্চ বা চ্ছ হয়। যথা : উৎ + চারণ = উচ্চারণ।

(৫) তা কিংবা দা এর পরে জা কিংবা ঝা থাকলে তা ও দা এর পরিবর্তে জ্জ হয়। যথা : উৎ + জল = উজ্জল।

(৬) ডা অথবা লা পরে থাকলে ‘তা’ ও ‘দা’ এর স্থলে ড্ভা, দ্ভা হয়। যথা : উৎ + লাস = উদ্ভাস।

(৭) শা পরে থাকলে ‘তা’ ও ‘দা’ এর স্থলে ছা হয়। যথা : উৎ + শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল।

(৮) যা এর পরে তা কিংবা থা থাকলে তা এর পরিবর্তে ‘টা’ এবং ‘থা’ এর পরিবর্তে ঠা হয়। যথা : নষ + ত = নষ্ট।

(৯) হা এর পরে থাকলে তা কিংবা দা এর স্থলে ধা হয়। যথা : উৎ + হার = উদ্ধার।

(১০) মা এর পরে বর্ণীয় (কা হতে মা পর্যন্ত) থাকলে মা এর পরিবর্তে সেই বর্ণের বর্ণ হয়। যথা : শাম + ত = শান্ত।

(১১) মা এর পরে যা বা লা, বা, হা, সা থাকলে মার এর পরিবর্তে একফুদ হয়। যথা : সম + সার = সংসার।

বচন

ব্যাকরণে বচন শব্দটির অর্থ কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর সংখ্যা পরিমাণ বিষয়ক ধারণা জ্ঞাপন করা অর্থাৎ যা দ্বারা বস্তু বা প্রাণীর সংখ্যা জ্ঞান অথবা পরিমাপ জ্ঞান প্রকাশ করা হয়ে থাকে। যেমন : গুরবুয়, গুরউন, গাচ্ছুয়, গাচ্ছুন, পানিয়ান-পানিয়ানিই ইত্যাদি।

উপরোক্ত উদাহরণে গুরুবুয় বলতে একটিমাত্র গুর (শিশুকে)কে বুঝানো হয়েছে আর গুরউন দ্বারা একের অধিক- দশ, বিশ যা আরো অধিক গুরদের বুঝানো হয়েছে। আবার পানিয়ান বলতে একটি নির্দিষ্ট আধারের পানিকে মাত্র বুঝানো হচ্ছে। কিন্তু পানিয়ানিই বলতে অনেক নদ-নদীর এমনকি সাগর-মহাসাগরের পানিরাশিও একত্রে বুঝাচ্ছে।

সংজ্ঞা যা দ্বারা কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের এক বা একাধিক সংখ্যা জ্ঞান বা পরিমাণ জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকে তাকে বচন বলে।

বচন দুই প্রকার। যথা : একবচন ও বহুবচন।

একবচন : যে শব্দের সাহায্যে একটিমাত্র ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীকে বুঝায় তাকে একবচন বলে। যথা মানুষ, ভাঙুয়, কাবরান, মুই, তুই, তে ইত্যাদি।

বহুবচন : যে শব্দের সাহায্যে একের অধিক ব্যক্তি, বস্তু, বা প্রাণীর সংখ্যা ও পরিমাপ বুঝায় তাকে বহুবচন বলে। যথা কাউন্যাউন, পিলাউন, তাগলানিহ ইত্যাদি।

শ্রীনানখন বাবু তাঁর বাংলাদেশের চাকমা ভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থের ৫৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন, স্বরাস্ত ও ব্যঞ্জনাস্ত ভেদে শব্দের শেষে উয়, বুয়, আন বিভক্তি যুক্ত করে একবচন এবং উন, গুন, আনিহ্ যুক্ত করে বহুবচন হয়ে থাকে। তিনি একই অনুচ্ছেদে ইহাও বলেছেন যে, প্রাণীবাচক শব্দের শেষে উন, গুন বিভক্তি যুক্ত করে বহুবচন এবং অপ্রাণীবাচক শব্দের শেষে আনিহ্ যুক্ত করে বহুবচন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে তা সঠিক নয়। যেমন :

স্বরাস্ত শব্দে :

স্বরাস্ত	একবচন	বহুবচন
সোলোই	সলোইয়ান-	সলোইয়ানিহ্
তোলোই	তলোইয়ান-	তলোইয়ানিহ্

চোড়োই	চোড়োবুয়	চোড়োইয়ুন
বোড়োই	বোড়োইবুয়	বোড়োইয়ুন

ব্যঞ্জনান্ত শব্দে :

কাবড়	কাবড়ান	কাবড়ানিহ্
নাগর	নাগরান	নাগরানিহ্
চুর	চুরবুয়	চুরুন
কুড়	কুড়বুয়	কুড়উন

প্রাণীবাচক :

পেক	পেকুয়	পেকুন
ডুর	ডুরবুয়	ডুরুন

অপ্রাণীবাচক :

তালা	তালাবুয়	তালাউন
ছিলুম	ছিলুমুয়	ছিলুমুন

তাই আমার মতে এটি এখনো গভীরভাবে গবেষণার বিষয়। তদ্ব্যতীত, যাচ্ছে তা বলে অথবা অন্যায় কোনো সমাধানের ব্যবস্থা না নিয়ে যেসব শব্দের একবচনে উয়, বুয়, আন থাকবে সেগুলিতে বহুবচনে বিবর্তনের সময় উন, গুন, এবং আনিহ্ বিভক্তি যোগ করে গেলেই মঙ্গল হয়।

যে সমস্ত পদ বা শব্দের শেষে একবচনে আন এবং বহুবচনে আনিহ্ বিভক্তি যুক্ত হয় তা হলো সকল প্রকার রোগ (গোটা জাতীয়গুলি বাদে, যথা ডেম্বল, পিঝিলা, ডলা, ফড়া), সব যান, ময়লা আবর্জনা জাতীয় জিনিস সকল তরল জিনিস, বাঁশ ও গাছের ফালি বা টুকরো বিশেষ সব মাটি (পাথর বাদে) একবচনে আন এবং বহুবচনে আনিহ্ বিভক্তি যুক্ত হয়ে থাকে। যথা একবচনে- জুরান, কাঙেল পীড়াআন, নআন, ট্রোনান, সেপপান, সিগোনান, কাজরান, পজাআন, পানিয়ান, সর্বত্তান, টেঙেরা কেমান, তজ্জাআন, বহুবচনে- জুরানিই, কাঙেল পীড়ানিহ্, নাআনিহ্, ট্রোনানিহ্, সেপপানিহ্ ইত্যাদি।

তবে রোগের ক্ষেত্রে রোগ যখন উদ্ভেত জাতীয় কিছু হয় তবে সেক্ষেত্রে একবচনে উয়, বুয় এবং বহুবচনে উন, গুন প্রত্যেকটি যুক্ত হয়। যথা একবচনে ফোড়াবুয়, পিজিলাবুয়, ডলাবুয় এবং বহুবচনে ফোড়াউন, পিজিলাউন, ডলাউন ইত্যাদি।

যে কোনো প্রকার বস্তু, যা দ্বারা একটি একক পরিমাপ করা যায়, সে

ক্ষেত্রে একবচনে উয়, বুয় এবং বহুবচনে উন, গুন প্রত্যয় যুক্ত হয়। যথা : ভেরাবুয়, কাল্ল্যুয়, গলাবুয় এবং বহুবচনে ভেরাউন, কাল্ল্যুয়ুন, গলাউন ইত্যাদি।

প্রাণী মাঝেই একবচনে উয়, বুয় এবং বহুবচনে উন, গুন, প্রত্যয় যুক্ত হয়ে থাকে। যথা একবচনে- এহতুয়, বাকুয়, পেকুয়, পিগিরাবুয় এবং বহুবচনে- এহতুন, বাকুন, পেকুন, পিগিরাউন।

আবার লম্বা বা খাটো, ছোট বা বড় এবং চ্যাপটা যা দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো একক নির্ধারণ করা সম্ভব নহে সেসব ক্ষেত্রে একবচনে আন এবং বহুবচনে আনিহ্- প্রত্যয় যুক্ত হয়ে থাকে। যথা- ধুদিয়ান, রোজেইয়ান, তোলোইয়ান, মেজাঙান, মুজুরীয়ান ইত্যাদি।

তবে গুণবাচক বিশেষ্যের ক্ষেত্রে একবচনে উয়, বুয় আন এবং বহুবচনে- উন, গুন, আনিহ্ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে থাকে। যথা :

একবচন

বহুবচন

ডোল, ডোল্লুয়

ডোলুন, ডোলান, ডোলানিহ্

বজং, বজংলুয়

বজঙুন, বজঙান, বজঙানি।

লিঙ্গ

লিঙ্গ শব্দের অর্থ আমরা বিশেষ চিহ্ন অর্থাৎ লক্ষণযুক্ততা হিসাবে ধরে নিতে পারি। কারণ নামবাচক শব্দের মধ্যে পুরুষ, স্ত্রী ও ক্লীব ভাব বা লক্ষণযুক্ততাকে লিঙ্গ বলা হয়ে থাকে। সকল প্রাণী ও বস্তুকে পুরুষ, স্ত্রী ও ক্লীব ভেদে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। আর তদনুযায়ী নামবাচক শব্দগুলোকে (ক) পুংলিঙ্গ, (খ) স্ত্রীলিঙ্গ ও (গ) ক্লীবলিঙ্গ নামে তিনটি শ্রেণীতে নামকরণ করা যায়।

ক) পুংলিঙ্গ : যে সমস্ত শব্দের দ্বারা শুধুমাত্র পুরুষ জাতীয় বিশেষ্য পদের নাম বুঝায় তাদের পুংলিঙ্গ বলে। যথা : বাপ, দাদাল, রাদা ইত্যাদি।

খ) স্ত্রীলিঙ্গ : যে সমস্ত শব্দের সাহায্যে শুধুমাত্র স্ত্রী জাতীয় বিশেষ্য নাম প্রকাশ পায় তাদেরকে স্ত্রী লিঙ্গ বলে। যথা : ভুজি, নানু, কালাবি ইত্যাদি।

গ) ক্লীবলিঙ্গ যেসব বিশেষ্য প্রাণীবাচক নহে, অধিকন্তু তাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ নির্ণয়ের প্রয়োজনও পড়েনা অর্থাৎ যা দ্বারা শুধুমাত্র অচেতন পদার্থকে মাত্র বুঝানো হয়ে থাকে, তাদের ক্লীব লিঙ্গ বলে। যথা বই, কলম, লাঙ্গল, তাগল, বারেং ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতীত আরো কিছু সংখ্যক শব্দ আছে যা দ্বারা পুরুষ ও স্ত্রী জাতী উভয়কেই বুঝানো হয়ে থাকে তাদেরকে উভয় লিঙ্গ বলে। যথা মানুষ, গুর, গাভুর, বুড় ইত্যাদি।

চাকমা ভাষায় প্রধানত দুটি উপায়ে পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দে পরিবর্তন করা হয়ে থাকে। যথা : ভিন্ন শব্দ যোগে এবং পুরুষ ও স্ত্রী প্রত্যয় যোগ করে।

ক) পৃথক শব্দ যোগে :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বাপ	মা
আজু	নানু
দাধা	বেবেহই
কাঁকা	কাঁকী
পিঝা	পিঝেই
বোনোই	ভুজি

খ) পুরুষ ও স্ত্রী প্রত্যয় যোগে :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
কালাচান	কালাবি
রাঙাধন	রাঙাবি
জেরবুয়ধন	জেরবুয়পুদি
নুয়রাম	নুয়বি
বুজ্যা	বুড়ী।

ক্রিয়ামূল বা ধাতু

একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে ক্রিয়াপদ হলো তার প্রাণ। ক্রিয়াপদকে বাদ দিয়ে একটি সার্থক বাক্য গঠিতও হতে পারে না যার ফলে বাক্যের স্বরূপও বিকশিত হতে পারে না। এবারে আমরা সে ক্রিয়াপদের মূল কী আর তাকে আমরা কী নামে চিহ্নিত করতে পারি তা দেখা যাক।

মুই যাং।

তে ধরে।

উপরোক্ত দুটি বাক্যের যাং এবং ধরে শব্দ দুটি ক্রিয়াপদ। যদি উক্ত শব্দ দুটির বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে দেখা যায় যে, যাং ক্রিয়ার মূলে আছে ‘যা’ এবং ধরে ক্রিয়ার মূলে আছে ‘ধর’। আর যাং এবং এ দুটি হলো ক্রিয়াপদগুলির বিভক্তি এবং যা ও ধর দুটো হলো ক্রিয়ার অভিভাজ্য অর্থাৎ যাকে আর বিশিষ্ট করা যায় না এমন অংশ বা মৌলিক অংশ বা মূল অংশ।

সংজ্ঞা : ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষণ করে যে মূল পাওয়া যায় আর যা শুধুমাত্র ক্রিয়ার স্বরূপগত অর্থ জ্ঞাপন করে ব্যাকরণে তাকে ধাতু বলা হয়। ক্রিয়াপদের প্রকৃত মূল বলে তাকে ক্রিয়ার প্রকৃতিও বলা হয়।

ক্রিয়াপদ বা ধাতুর মূল + এর চিহ্ন। গর, ল, লেখ, যা, পড়, বুন ইত্যাদি।

প্রত্যয়

ধাতু বা ক্রিয়ামূলের সাথে (উত্তর) ভিন্ন ভিন্ন অর্থযুক্ত বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি যুক্ত হয়ে ধাতুর যে নতুন শব্দ গঠন করে সে সব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে প্রত্যয় বলে। যথা পড় + আ = পড়া, দাম + ই = দামী ইত্যাদি। প্রত্যয় দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা : কৃৎ প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়।

কৃৎ প্রত্যয় : ধাতু বা ক্রিয়ার মূলের সাথে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ সৃষ্টি করে তাকে কৃৎপ্রত্যয় বলে। যথা : যা + না = যানা, ধর + আ = ধরা ইত্যাদি।

তদ্ধিত প্রত্যয় : শব্দ বা নামের পরে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ সৃষ্টি করে তাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যথা : জুম + অত = জুমত, মান + ই = মানি ইত্যাদি।

চাকমা ভাষায় কতকগুলি কৃৎ প্রত্যয় :

অ- গুল + অ = গুল,

আ- পড় + আ = পড়া,

অন- চল + অন = চলন,

অর- ধর + অর = ধরর

অনি- ঢাক + অনি = ঢাঘনি

ইয়া- নাচ + ইয়া = নাজিয়া,

ওক- ধর + ওক = ধরোক

য- পূজ + য = পূজ্য

কতকগুলি তদ্ধিত প্রত্যয় :

অই- পাচ + অই = পাজই,

অর- লুয় + অর = লুয়র,

লুয়- মেঘ + লুয় = মেঘোলুয়,

খোর- মদ + খোর = মদখোর,

ধাক্কা + বাজ = ধাক্কাবাজ।

পদ প্রকরণ

বাক্যস্থিত শব্দ মাত্রই এক একটি পদ। অর্থাৎ বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দগুলিকে পদ বলা হয়।

পদ প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত। যথা : সব্যয়পদ ও অব্যয়পদ।

সব্যয়পদ : যে পদে বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিভক্তি, প্রত্যয় ইত্যাদি যুক্ত হয়ে থাকে সে পদগুলিকে সব্যয় পদ বলে। যথা : ফগনা ঝারৎ যায়। সব্যয়পদ চার প্রকার। যথা : বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও ক্রিয়া।

বিশেষ্য পদ : যে পদ দ্বারা কোনো কিছুর নাম বুঝায় তাকে বিশেষ্য পদ বলে। যথা : দাড়ি, ঢাকবাধি, এহত, হএল ইত্যাদি। বিশেষ্য পদ আবার ৬ ভাগে বিভক্ত। যথা : নামবাচক, জাতিবাচক, সমষ্টিবাচক, বস্তুবাচক, গুণবাচক ও ক্রিয়াবাচক।

নামবাচক বিশেষ্য : যে পদে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি, স্থান ও বস্তুর নাম বুঝায় তাকে নামবাচক বিশেষ্য বলে। যথা : চিলা, ঠাণ্ডাম্যাকলক, টিঙি ইত্যাদি।

জাতিবাচক বিশেষ্য : যে পদে কোনো জাতি বা শ্রেণীর নাম বুঝায় তাকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন : চাংমা, মানুষ, ধান ইত্যাদি।

সমষ্টিবাচক বিশেষ্য : যে পদে কোনো দল বা সমষ্টিকে বুঝায় তাকে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য বলে। যথা : সভা, শ্রেণী ইত্যাদি।

বস্তুবাচক বিশেষ্য:- যে পদে কোনো বস্তু বা দ্রব্যের নাম বুঝায় তাকে বস্তুবাচক বিশেষ্য পদ বলে। যথা- পানি, পিদোল, নুন, পিড়া ইত্যাদি।

গুণবাচক বিশেষ্য : যে পদে বিশেষ্যের গুণ বা ধর্ম বুঝায় তাকে গুণবাচক বিশেষ্য বলে। যথা : সুখ, খেমা, ইহুংসা, অসৎ ইত্যাদি।

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য : যে পদ দ্বারা বিশেষ্যের কোনো কাজের নাম বুঝায় তাকে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বলে। যথা : লেগা, পড়া ইত্যাদি।

বিশেষণ পদ : যে পদ দ্বারা বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, পরিমাণ ও সংখ্যা ইত্যাদি বুঝায় তাকে বিশেষণ পদ বলে। যথা : চলদি-গাড়ি, তুই দয়াল, ঝাদি যা ইত্যাদি। উপরোক্ত বাক্যদ্বয়ে প্রথমে চলার কথা, দ্বিতীয়টিতে গুণ কথা এবং তৃতীয়টিতে যাবার অবস্থা বুঝানো হয়েছে। আর বিশেষণের বিশেষণ হলো দোদোক্যা রাঙা, চাগলক্যাহ

কাল ইত্যাদি।

সর্বনামপদ বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যে পদ বসে তাকে সর্বনাম পদ বলে। যথা মুই, তুই, তে, সিবা, সিয়ান, কন্নাহ, কুখুন ইত্যাদি। সর্বনাম পদ দশ ভাগে বিভক্ত। যথা ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক, আত্মবাচক, সামীপ্যবাচক, দূরত্ববাচক, সাকল্যবাচক, প্রশ্নবাচক, অনির্দিষ্টবাচক ইত্যাদি।

১) ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক মুই, আমি, তুই, তুমি, তে, তারা ইত্যাদি।

২) আত্মবাচক : নিজে।

৩) সামীপ্যবাচক (নিকটবর্তীতা) : ইবা, সিবা ইত্যাদি।

৪) দূরত্ববাচক : উহুগুন, উহইদু ইত্যাদি।

৫) সাকল্যবাচক : বেক, মজলম ইত্যাদি।

৬) প্রশ্নবাচক : কন্না, কুভ, কার ইত্যাদি।

৭) অনির্দিষ্টবাচক : কিয়েহ, কনহ, ইত্যাদি।

৮) ব্যতিহারিক (যুগপৎ একই) : নিজে নিজে, আপঝে ইত্যাদি।

৯) সংযোগজ্ঞাপক : যে যার, যারা ইত্যাদি।

১০) অন্যাদিবাচক : অন্য অপর, পর ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদ যে পদের দ্বারা কোনো কাজ করা বুঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে। যেমন ঘুম যানা, পাখানা, বেড়ানা, ডলাকানা ভাত খার, ঝেদোরি পেক রাঘার ইত্যাদি।

ভাব প্রকাশের দিক থেকে ক্রিয়াপদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়া।

সমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্যের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় তাকে সমাপিকা ক্রিয়াপদ বলে। যথা বেলান ডুপ্পেগোই, ছাগল্লুয় ঘাছ খার।

অসমাপিকা ক্রিয়া : যে সব ক্রিয়াপদের দ্বারা বাক্য শেষ হয় না বা ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হতে পারে না তাকে অসমাপিকা ক্রিয়াপদ বলে। যথা : ঢাকবাদি জুমত যেইনায়, ফাদা খুল ভাত খেইনায় ইত্যাদি।

কর্ম হিসাবে সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়া আরো দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে। যথা : সক্রমক ক্রিয়া ও অক্রমক ক্রিয়া।

সক্রমক ক্রিয়া যে ক্রিয়ার কর্মপদ থাকে তাকে সক্রমক ক্রিয়া বলে। যথা উন্দুরবুয় চাল কামাডার (সক্রমক সমাপিকা ক্রিয়া এবং ফগনা খেইনায় ও ভলা গাদিনায়। (অসমাপিকা অক্রমক ক্রিয়া) ইত্যাদি।

ক্রিয়ার কাল

ক্রিয়া অর্থাৎ কাজ সংঘটিত হবার সময়কে ব্যাকরণের ভাষায় কাল বলে।
যেমন : পড়ং, খিয়ছ, থেব ইত্যাদি।

উক্ত তিনটি উদাহরণে বাক্যের প্রথমটিতে কার্য সম্পাদনের সময় (বর্তমান), দ্বিতীয় বাক্যে (অতীত) এবং তৃতীয় বাক্যে (ভবিষ্যৎ) কাল বুঝাচ্ছে।

সুতরাং কার্য সম্পন্ন হবার সময় বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ সময়ের নির্দেশই হলো কাল। সে হিসাবে ক্রিয়া সংঘটিত হবার সময়ের ভিত্তিতে কাল প্রধানত তিন প্রকার। যথা অতীত কাল, বর্তমান কাল ও ভবিষ্যৎ কাল।

অতীত কাল : কোনো কাজ অতীত অর্থাৎ গত সময়ে সম্পন্ন হয়েছিল বা হয়ে গিয়েছিল ক্রিয়ার সে সময়কে অতীত কাল বলে। যথা মুই কিল্যা যিয়ং, তে পয্যে ইত্যাদি।

বর্তমান কাল : কোনো কাজ বর্তমান সময়ে সম্পন্ন হয় বা হচ্ছে বুঝালে ক্রিয়ার সে সময়কে বলে বর্তমান কাল। যথা ঢেলা পড়ের, তে খায় ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ কাল : কোনো কাজ আগামী সময়ে হবে বা হতে থাকবে ক্রিয়ার সে সময়কে ভবিষ্যৎ কাল বলে। যথা : দাড়ি জুমত যেব, টেরা ভাত খেব ইত্যাদি।

কাজের রূপভেদ হিসাবে উক্ত তিনটি কালকে আরো কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন :

বর্তমান কাল :

ক) সাধারণ বা নিত্য বর্তমান : পুদিবাবে ভাত খায়,

খ) নিত্যবৃত্ত বর্তমান : পুগেদি বেল উধে।

গ) ঘটমান বর্তমান : কেরোরি কাবর বুনের।

ঘ) পুরাঘটিত বর্তমান : খঞ্জন্যা এহক্ষনসং কাল্যাং বুনের।

ঙ) বর্তমান অনুজ্ঞা : তুমি খগোই।

অতীত কাল :

ক) সাধারণ অতীত : বাস্তিবুয় ময্যেহ।

খ) নিত্যবৃত্ত অতীত : এ গাছ্যত ফুল ফখাক।

গ) ঘটমান অতীত : তারা সেক্কে ভাত হাদন ।

ঘ) পুরাঘটিত অতীত : ঝড় থেগেবার আগেই আমি লুহঙ্যেয়িহ ।

ভবিষ্যৎ কাল :

ক) সাধারণ ভবিষ্যৎ : খাঙ্কে ঝড় এভ ।

খ) ঘটমান ভবিষ্যৎ : ডলাকানা ন বেবহ ।

গ) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ : তে যেবার আগে মুই ফিরিম ।

ঘ) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা : খামাঙ্কাই এবেহ স্যা ।

কারক ও বিভক্তি

কারক অর্থ যা ক্রিয়া সম্পাদন করে। কিন্তু ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য ব্যক্তি, বস্তু, উপকরণ, স্থান ও কাল ইত্যাদির প্রয়োজন পড়ে। ক্রিয়ার সাথে অর্থাৎ বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সাথে ঐগুলির যে সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে তাকে বা সে সম্পর্ককে কারক বলে।

সংজ্ঞা বাক্যে অন্তর্গত ক্রিয়াপদের সাথে অন্যান্য পদের যে সম্পর্ক তাকে কারক বলে। যথা : ফগনা ভেরালোই গলাখুন বিন্যাহ্ গরীবরে ধান দে। উক্ত বাক্যে দেখা যায় 'দে' ক্রিয়াপদের সাথে বাক্যস্থিত অন্যান্য পদগুলির এক একটি সম্পর্কের বিদ্যমানতা বর্তমান। যথা উক্ত বাক্যটি নিচে প্রদত্ত ছকে সাজালে আমরা দেখতে পাই :

প্রশ্ন	উত্তর	সম্পর্ক
১) কে দেয়?	ফগনা	কর্তা সম্পর্ক
২) কি দেয়?	ধান	কর্ম সম্পর্ক
৩) কিসে দেয়?	ভেরালোই	করণ সম্পর্ক
৪) কাকে দেয়?	গরীবরে	সম্প্রদান সম্পর্ক
৫) কোথা হতে দেয়?	গলাখুন	অপদান সম্পর্ক
৬) কখন দেয়?	বিন্যাহ্	অধিকরণ সম্পর্ক

উপরে বর্ণিত ছক হতে আমরা কারক নির্ণয়ের সহজ উপায় খুঁজে পেতে পারি। যথা :

১. ক্রিয়াকে কে প্রশ্নের উত্তরে যাকে পাওয়া যায় তাহা কর্তৃকারক বা ক্রিয়ার কর্তা বা যে ক্রিয়া সম্পাদক করে।
২. ক্রিয়াকে কি প্রশ্নের উত্তরে যা পাওয়া যায় তা কর্ম কারক বা কর্তা যা সম্পাদন করে। যেমন ধান দে। এখানে কি দেয় প্রশ্নের উত্তরে পাওয়া যায় ধান। সুতরাং ধান হলো কর্ম কারক।
৩. ক্রিয়াপদের কিসের দ্বারা বা কি দিয়ে প্রশ্নের উত্তরে যা পাওয়া যায় তা করণ কারক। এখানে কি দিয়ে দেয় প্রশ্নের উত্তরে পাওয়া যায় 'ভেরালোই'। সুতরাং এখানে কর্তা ভেরালোই (ভেরা দিয়ে) দেয় কার্যটি সম্পাদিত হয় বলে 'ভেরালোই' পদটি হলো করণ কারক।
৪. ক্রিয়াকে কাকে প্রশ্নের উত্তরে যা পাওয়া যায় তাকে সম্প্রদান অর্থাৎ

স্বত্ব ত্যাগ করে যে কার্য সম্পাদন করা হয় তা সম্প্রদান কারক। এখানে গরীবকে দেয় কার্যটি সম্পন্ন করেছে। সুতরাং গরীবকে সম্প্রদান কারক।

৫. ক্রিয়াকে কোথা হতে প্রশ্নের উত্তরে যা পাওয়া যায় তা অপদান কারক। এখানে গোলা হতে ধান দেয় কার্য সম্পাদন করা হয়। সুতরাং গোলাখুন অপদান কারক।

৬. অধিকরণ কারক : ক্রিয়াকে কখন, কোথায় ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে যা পাওয়া যায় তা অধিকরণ কারক। এখানে কখন দেয় প্রশ্নের উত্তরে পাওয়া যায় বিন্যাহ্ (সকালে)। সুতরাং বিন্যাহ্ অধিকরণ কারক।

কর্তৃকারক যে বা যারা কর্ম সম্পাদন করে তাকে বা তাদের বলে কর্তা। আর বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সাথে কর্তার যে সম্পর্ক তা কর্তৃকারক। যথা : পাক্কোই জুমত যায়। এ বাক্যে কে যায় প্রশ্নের উত্তর হলো পাক্কোই। তাই এখানে পাক্কোই হলো কর্তা আর যায় হলো পাক্কোই দ্বারা সম্পাদিত ক্রিয়া এবং জুমত হলো যাওয়া ক্রিয়া সম্পাদনের কর্ম বা ক্ষেত্র।

কর্মকারক : কর্তা যা করে তাই কর্ম। যথা : পাক্কোই জুমত যায়। এই বাক্যে পাক্কোই কোথায় যায় প্রশ্নের উত্তরে পাই “জুমত”। আর যায় ক্রিয়াটি জুমকে আশ্রয় করে বা কেন্দ্র করে সম্পাদিত হয়। তাই ‘জুমত’ হলো কর্ম বা জুমে যাওয়া ক্রিয়াটি সম্পাদিত হওয়া।

করণ কারক : কর্তা যা দ্বারা বা যাকে বা যেটিকে দিয়ে কর্ম সম্পাদন করে তা করণ অর্থাৎ কর্মটি সম্পাদনে যার সাহায্য নেয়া হয় তা করণ কারক। যথা : দাড়ি বেত্তোই কাল্লুয়ং বুনে। এখানে বুনে ক্রিয়াটি সম্পাদন হয় বেত দিয়ে। সুতরাং বেত্তোই হলো করণ কারক।

সম্প্রদান কারক : কর্তা কাউকে যদি স্বত্ব ত্যাগ করে কিছু দিয়ে থাকে, তাহলে তাকে বা গ্রহীতাকে সম্প্রদান কারক বলে। যথা : লেঙ্যারে দচ টেঙা দেগোই। এখানে লেঙ্যারে হলো সম্প্রদান করারক।

অপদান কারক যা হতে কোনো কিছু রক্ষিত, ভীত, উৎপন্ন, পতিত, বিচ্যুত, চলিত ইত্যাদি ক্রিয়া সম্পাদিত হয়ে থাকে তাকে অপদান কারক বলে। যথা : গুড়খুন বুড় অলে। উক্ত বাক্যে গুড়খুন অর্থাৎ শিশু হতে বা শিশুকাল হতে বুড়ো হওয়া ক্রিয়াটি সম্পাদিত হয়েছে। সুতরাং গুড়খুন হলো এখানে অপদান কারক।

অধিকরণ কারক : কর্তা যে স্থানে, যে সময়ে বা যে বিষয়কে আশ্রয় করে

ক্রিয়া সম্পাদন করে তা অধিকরণ কারক। যথা পুদিবাবে এচক দিন ঢাকাত এল। উক্ত বাক্যে পুদিবাবে ছিল ক্রিয়াটি সম্পাদন করেছিল ঢাকাতে। তাই এ বাক্যে ঢাকাত হলো অধিকরণ কারক। স্থান, কাল ও বিষয় ভেদে অধিকরণ কারক তিন ভাগে বিভক্ত। যথা- স্থানাধিকরণ, কালধিকরণ ও ভাবাধিকরণ।

স্থানাধিকরণ যে স্থানে কর্তা ক্রিয়াটি সম্পন্ন করে। যথা- ঝারত বাঘ থান। এখানে ঝারত স্থানাধিকরণ।

কালধিকরণ : কর্তা যে সময়ে ক্রিয়া সম্পন্ন করে। যথা- জারকাল্যা বিল-ছড়া গুগেই যান। এখানে জারকাল্যা কালধিকরণ।

ভাবাধিকরণ : যে ভাবে বা যে অবস্থায় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যথা- ভাবিনায় কুল ন-পায়। এখানে ভাবিনায় ভাবাধিকরণ।

সম্বোধন পদ যে পদে কাউকে সম্বোধন করা হয় তাকে সম্বোধন পদ বলে। যথা গুড়লক, গমে পয়্য। আজু, কেজান আঘচ? বাক্য দুটিতে গুড়লক ও আজু দুটি হলো সম্বোধন পদ।

বিভক্তি

কোনো ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি দ্বারা সৃষ্ট কোনো ভাব বা বস্তুর অর্থজ্ঞাপক শব্দগুলো মনের ভাব প্রকাশে যথা বিন্যাস না হলে সার্থক বাক্যে পরিণত হতে পারে না। তাতে বক্তার মনের ভাব অপরে প্রকাশ করতে না পারাতে ভাষার সফলতা লাভে ব্যর্থ হতে পারে। তাই মনের ভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশের জন্য নামপদ ও ক্রিয়াপদের সাথে কিছু চিহ্ন অর্থাৎ বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত করে বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সাথে নামপদগুলির একটা অন্বয় বা সম্পর্ক গড়ে তোলা হয় এবং তাতে মনের ভাব প্রকাশভঙ্গীও সুষ্ঠু হয়ে উঠে। যে সমস্ত চিহ্নরূপী বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত করা হয়ে থাকে সেগুলোকেই বিভক্তি বলা হয়। বিভক্তির সংজ্ঞার্থ আমরা নিম্নোক্তভাবে করতে পারি।

বাক্যে স্থিত ক্রিয়াপদের সাথে অন্যান্য পদগুলোর মধ্যে পারস্পারিক অন্বয় সাধন বা সম্পর্কের সুসামঞ্জস্য বজায় রেখে বক্তার মনের ভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্য নামপদ ও ক্রিয়াপদে কতকগুলো চিহ্নরূপী সংযুক্ত বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে বিভক্তি বলে। যথা খঞ্জন্যারে ডাক। বাক্যে খঞ্জন্যার সাথে 'রে' যুক্ত হওয়ায় তাকে ডাকবার ক্রিয়াটি স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। এই 'রে' টিই বিভক্তি। বিভক্তি দুই প্রকার। যথা : ক্রিয়া বিভক্তি ও শব্দ বিভক্তি।

ক্রিয়া বিভক্তি ধাতু বা ক্রিয়ামূলের উত্তর যে বিভক্তি অর্থাৎ বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে বাক্যস্থিত ক্রিয়ার সমাপিকা ক্রিয়া গঠন করে ঐ সমস্ত বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে ক্রিয়া বিভক্তি বলা হয়। যথা ফগনা যাল্লোই, তারা পখন ইত্যাদি।

শব্দ বিভক্তি বাক্যে ব্যবহৃত হবার কালীন বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের সঙ্গে যে বিভক্তি অর্থাৎ বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয় তাকে শব্দ বিভক্তি বলে। যথা : কুড়বুয় করকরার, গাচ্ছুন পাদানিহ ঝায়ে।

চাকমা ভাষায় কিছু শব্দ বিভক্তি পাওয়া যায়। যথা : উয়, বুয়, আন, রে, লোই, থুন, অ, এ ইত্যাদি। সে হিসাবে চাকমা শব্দ বিভক্তি সাত প্রকার।

শব্দ বিভক্তি রূপের ব্যবহার :

একবচন	বহুবচন
পেখ-পেকুয়	পেকুন-১মা
মর-মরে	আমারে- দ্বিতীয়া

বাচ-বাচোই
বাক-বাঘখুন-
সাপ-সাব চাম-
আহচ-আঝবদা
বাক-বাঘগুজুরন

বাচ্চুন্দোই- তৃতীয়া
বাক্কুনখুন- চতুর্থী
সাব চামানি- পঞ্চমী
আহঝ বদাউন- ষষ্ঠী
বাক্কুনে উরিং মারন- সপ্তমী

উপসর্গ

উপসর্গ এর নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, আবার এগুলি আলাদাভাবেও বাক্যে প্রয়োগ হয় না। এগুলির ব্যাপারে সহজ কথায় বলা যায়। এ নামে যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেগুলো এক শ্রেণীর অব্যয়। উপসর্গের প্রধান কাজ হলো নতুন শব্দ সৃষ্টি করা, ধাতুর সাথে যুক্ত হয়ে মূল অর্থের পরিবর্তন সাধন করা, অর্থের বিশিষ্টতা আনা। উপসর্গ সবসময় ধাতু বা শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, উপসর্গের দ্বারা শব্দের পাঁচ ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে। যথা :

নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করা।

শব্দের অর্থপূর্ণতা ঘটানো।

শব্দের অর্থের বিস্তার ঘটানো।

শব্দার্থের সংকোচন ঘটানো।

অর্থের পরিবর্তন সাধন করা।

যদি বলি ‘কাম’। যার সহজ অর্থ বা স্বাভাবিক অর্থ কার্য, কর্তব্য, পেশা, অভ্যাস ইত্যাদি বুঝায়। যদি তার আগে কু যুক্ত করা হলে কু + কাম = কুকাম হয়ে যায়। যার অর্থ নিন্দনীয় কাজ। এখানে ‘কু’ হলো ‘কাম’ এর উপসর্গ। চাকমা ভাষায় এরকম উপসর্গের উপস্থিতি মোট এগারটি দেখা যায়। যথা অ, (খারাপ অর্থে, অভাব অর্থে), যেমন- অ-কামর, অকথা, অকাল, অচিনা, অচল, অজানা, অমিল, অটেল, অসিঙিল, অঘা (রোকা অর্থে) যথা- অঘামানুষ, অঘামার্কী। অনা (অভাব ও নিয়মবর্হিভূত অর্থে)- অনাবৃষ্টি, অনাবাদী, অনাচার। আ (অভাব অর্থে প্রযোজ্য) যথা- আকায্যা, আধুইয়া, আপালাহ। আন (বিক্রিষ্ট অর্থে প্রযোজ্য) যথা- আনমনা। উন (কম অর্থে প্রযোজ্য)- উনভাদে দুনবল। কু (খারাপ, কুৎসিত অর্থে প্রযোজ্য) যথা- কুখাস্যেক, কুকথা, কুঅভ্যাস, কুকাম। পাডি (ছোট অর্থে প্রযোজ্য)- পাডি আহচ। বি (নাই অথবা নিন্দনীয় অর্থে প্রযোজ্য) যথা- বিফল, বিপদ, বিপাক। ভর (পূর্ণতা অর্থে প্রযোজ্য) যথা- ভরাপেট, ভরপুর, ভরাসাঝ, ভরাসচ। সু (উত্তম অর্থে প্রযোজ্য) যথা- সুনজর, সুখবর, সুদিন, সুমাধান, সুনাঙ। অজ(অতি অর্থে প্রযোজ্য) যথা- অজক্ললক, অজহমর।

চাকমা ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট কিছু বিদেশী উপসর্গ :

ফারসী-

কার- (কাজ অর্থে)- কারখানা, কারবার ।

নিম- (আধা অর্থে)- নিমরাজি

বদ- (মন্দ অর্থে)- বদমেজাজ, বজ্জাত

বে- (না অর্থে)- বেআদব, বেআক্লম

ব- (অহিত অর্থে)- বকলম

আরবী-

লা- (না অর্থে)- লাপাত্তা

বাজে- (বিবিধ অপ্রয়োজীয় অর্থে)- বাজে খরচ, বাজে কথা, বাজে কাম ।

গর- (অভাব অর্থে)- গরমিল, গরহাজির ।

ইংরেজী-

ফুল- (পূর্ণতা অর্থে)- ফুল আহত, ফুল সাট

হাফ- (আধা অর্থে)- হাফ প্যান্ট, হাফ সাট

হেড- (প্রধান অর্থে) হেডমাষ্টার, হেডম্যান

সাব- (অধীন অর্থে) সাবজোন, সাবইনস্পেক্টর

দ্রষ্টব্য কা এবং খা বর্ণ দুটি যদিও শব্দের প্রথম স্থানে থাকলে তাদের ধ্বনি যথাক্রমে ঘোষ অল্পপ্রাণ বাংলার ‘হা’ এবং ঘোষ মহাপ্রাণ বাংলার ছা ধ্বনি হয়ে থাকে, কিন্তু যদি উপসর্গের অব্যবহিত পরবর্তী স্থানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তখনও তাদের উচ্চারণ প্রথম স্থানের মতোই থাকে বা থাকবে । যথা- অকাল, কুখাস্যেথ ইত্যাদি ।

দ্বিরুক্ত শব্দ

দ্বিরুক্ত শব্দটির অর্থ হলো দুইবার উক্ত হওয়া এমন। চাকমা ভাষাতে এমন কিছু শব্দ বা পদ আছে যেগুলির একবার ব্যবহারে যে অর্থ প্রকাশিত হয়ে থাকে, সেগুলোকে পাশাপাশি দুবার ব্যবহার করলে অন্যরকম অর্থ প্রকাশ করে। এ ধরনের শব্দের পাশাপাশি দুইবার ব্যবহারকেই দ্বিরুক্ত শব্দ বলে। যথা- কিয়ান ভারি থরথয়্যা উইয়ে। দ্বিরুক্ত শব্দ দুই প্রকার। যথা- শব্দের দ্বিরুক্তি ও পদের দ্বিরুক্তি।

শব্দের দ্বিরুক্তি:- একই শব্দ পাশাপাশি দুইবার উচ্চারিত হয়ে যদি কোনো বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে তাকে শব্দের দ্বিরুক্তি বলে। যথা : গম গম কাবড়, ফুলঃ ফুলঃ ভাব ইত্যাদি। সাধারণত তিনটি উপায়ে শব্দের দ্বিরুক্তি ঘটে থাকে। যথা :

- (১) একই শব্দের সাথে সমার্থক আরো একটি শব্দ ব্যবহার করে। যথা-
ধন-মান, বিদ্যা-বুদ্ধি।
- (২) দ্বিরুক্ত শব্দের জোড়া শব্দটির আংশিক পরিবর্তন সাধন করে। যথা-
খারা-তারা, ধন-সম্পদ ইত্যাদি।
- (৩) সমার্থক অথবা বিপরীতার্থক শব্দ ব্যবহার করে। যথা- এযানা-যানা,
খানা-দানা ইত্যাদি।

পদের দ্বিরুক্তি একটি বিভক্তি যুক্ত পদ পাশাপাশি দুইবার উচ্চারিত হয়ে যদি কোনো বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে তাকে পদের দ্বিরুক্তি বলে। যথা-
ভাবদে ভাবদে কুল নেই, ঘুমে ঘুমে রাত কারর ইত্যাদি।

অনুকার দ্বিরুক্তি : কোনো শব্দের অনুকরণে সৃষ্ট ধ্বনি পাশাপাশি দুইবার উচ্চারিত হয়ে যদি কোনো বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে তাকে অনুকার দ্বিরুক্তি বলে। যথা- আহজি খলক খলক, জুঁত-জুঁত বুয়ার ইত্যাদি।

পদাত্মক দ্বিরুক্তি :

(ক) বিভক্তিযুক্ত পদ যদি পাশাপাশি দুইবার ব্যবহৃত হয়ে কোনো বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে তাকে পদাত্মক দ্বিরুক্তি বলে। যথা- গাঝে গাঝে ফুল ফুন্তন।

(খ) পদাত্মক দ্বিরুক্তি বা পদের দ্বিরুক্তির মাধ্যমে জোড়া রীতিতে সৃষ্ট দ্বিরুক্ত পদের ব্যবহারে। যথা- কাবড়-চুবড়ে ফিটফাট।

ধন্যাত্মক দ্বিরুক্তি : কোনো ধ্বনি বিশেষের অনুকরণে সৃষ্ট দ্বিরুক্ত শব্দকে

ধন্যাত্মক বা অনুকার দ্বিরুক্তি বলে। যথা- ভে ভে গুড়ি কানের, চেঁ চেঁ গুড়ি ডগরের।

দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োজনীয়তা ভাষায় দ্বিরুক্ত শব্দ ব্যবহারে ভাষার শ্রুতিমাধুর্য সৃষ্টি করে ভাষার সৌষ্টব বর্ধিত হয়। দ্বিরুক্ত শব্দগুলির সহায়তায় মনের অপ্রকাশিত ভাবকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সরাসরি কোনো কিছু পেশ না করে এই দ্বিরুক্ত শব্দের সাহায্যে ভাব্যতা বজায় রেখে প্রকাশ করতে পারা যায়। তাছাড়া দ্বিরুক্ত শব্দ কোনো বড় ভাব বা বিষয়কে সংক্ষেপে প্রকাশ করতে পারে। তজ্জন্য চাকমা ভাষায় এই দ্বিরুক্ত শব্দগুলো একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

সংখ্যাবাচক শব্দ

সংখ্যা শব্দের অর্থ হলো গণনার দ্বারা লব্ধ ধারণা বা জ্ঞান। সংখ্যা গণনার প্রধান একক হলো- এক। সে হিসাবে সংখ্যাবাচক এক, একাধিক, প্রথম, প্রাথমিক ইত্যাদির ধারণা লাভ করা যায়। যেমন- একজন, পাঁচজন অর্থাৎ পাঁচজনকে একজন একজন করে নিলে হয় পাঁচজন।

সংখ্যাবাচক শব্দগুলি আমরা চার ভাগে বিভক্ত করতে পারি। যথা- অঙ্কবাচক, পরিমাণ বাচক, ক্রম বা পূরণবাচক এবং তারিখ বাচক।

অঙ্কবাচক:- পাঁচ দিন বলতে এক দিনের পাঁচটি একক বা এককের সমষ্টি বুঝায়। যেহেতু আমাদের একক হলো এক সে হিসাবে এক + এক + এক + এক + এক = পাঁচ দিন।

পরিমাণ বা গণনা বাচক সংখ্যা : একই একক গণনা করলে যে সমষ্টি পাই সেটিই পরিমাণ বা গণনা বাচক সংখ্যা। যেমন- বছর বলতে আমরা বার মাসের অর্থাৎ বারটি মাসের সমষ্টি বুঝি। এখানে মাস একটি একক। এইরকম বারটি মাস বা বারটি মাসের এককের মিলনেই সৃষ্টি হয় বছর।

পূর্ণ সংখ্যার গুণবাচক সংখ্যা : যেমন একেকে এক ($1 \times 1 = 1$), দুই দ্বিগুণ বা দুগুণ = ৪, তিন তিরিকে নয় ইত্যাদি।

ক্রমবাচক সংখ্যা : একই সারি দল বা শ্রেণীতে অবস্থিত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যার ক্রম বা পর্যায় বুঝাতে ক্রমবাচক সংখ্যা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন- প্রথম বেঞ্চিতে, তৃতীয় সারির ইত্যাদি।

তারিখবাচক শব্দ তারিখ বুঝাতে যে সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয় তাকে তারিখবাচক শব্দ বলে। যেমন- ১লা জানুয়ারি, ৫ই এবং ৮ই ইত্যাদি। সবশেষে ১৯ থেকে ৩১ পর্যন্ত লিখতে হয় শে। যথা ১৯শে, ৩১শে ইত্যাদি।

বাক্য প্রকরণ

সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত কিছু সংখ্যক অর্থজ্ঞাপক শব্দ বা পদ সৃষ্টির দ্বারা যখন মানুষের মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হতে পারে তখন তাকে বাক্য বলে। যথা- ফগনা দাড়ি আ পাক্কাইদাঘি উদছড়ীত থান। একটি বাক্যে দুটি অংশ থাকে। যথা- উদ্দেশ্য ও বিধেয়।

উদ্দেশ্য : বাক্যের যে অংশে কোনো বা কারও বিষয়ে কিছু বলা হয় সে অংশকে বাক্যের উদ্দেশ্য অংশ বলে। যথা- ফগনা, দাড়ি পাক্কাইদাঘি উদছড়ীত থান। উক্ত বাক্যে আমরা দেখতে পাই ‘থান’ (থাকে বা বাস করে) ক্রিয়াটি তাদের তিন জনকে উদ্দেশ্য করেই বা ভিত্তি করেই সম্পাদিত বা নিষ্পন্ন হয়েছে। তজ্জন্য তারা তিন জনই এই বাক্যের উদ্দেশ্য অংশ। সাধারণত বাক্যের উদ্দেশ্য হলো কারও বা কিছুর সম্পর্কে ক্রিয়া সম্পাদিত করা।

বিধেয় : বাক্যের যে অংশে বাক্যটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো ক্রিয়া সম্পাদিত হওয়া প্রকাশ পায় বা তাকে অর্থাৎ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র বা ভিত্তি করে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় বুজায়, বাক্যের সে অংশকে বাক্যের বিধেয় বলে। উপর্যুক্ত বাক্যে যেহেতু ফগনা, দাড়ি আ’ পাক্কাইদাঘিকে ভিত্তি করে থান ক্রিয়াপদটি সম্পন্ন হয়েছে, তাই উদছড়ীতে থান অংশটি হলো বাক্যটির বিধেয় অংশ।

আমরা দেখতে পাই একটি ভাষার মূল উপকরণ হলো বাক্য; আর একটি সার্থক বাক্যের আসল উপাদান হলো অর্থদ্যোতক শব্দ এবং শব্দের মৌলিক উপাদান হলো ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি। এই অর্থজ্ঞাপক শব্দ বা শব্দসমষ্টির সূত্রাশ্রয়ী রীতি পরম্পরানুযায়ী সমন্বিত হবার ফলে যখন একটি মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে তখনই তাকে বাক্য বলা হয়। তজ্জন্য ইহা উল্লেখ্য যে, মানব মনের ভাব বিশুদ্ধভাবে প্রকাশ করা প্রয়োজন। আর সে বিশুদ্ধতা ধ্বনিকে কেন্দ্র করেই সম্বলিত। সে কারণে একটি বিশুদ্ধ সার্থক বাক্য কেবল চিন্তার একক হিসাবে পরিগণিত হয়। তজ্জন্য ইহা মনে রাখতে হবে যে, একটি সার্থক বাক্য হলো এক বা একাধিক শব্দের সমষ্টি। আবার ইহাও মনে রাখতে হবে যে, যে কোনো পদসমষ্টি আবার একটি সার্থক বাক্য হিসাবে যোগ্যতা লাভ করতে পারে না। তাই আমরা ইহা দৃঢ়ভাবে ধরে নিতে পারি, সুবিন্যস্ত পদসমষ্টির সাহায্যে যখন মনের ভাব বা আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা যায় তখনই ঐ পদসমষ্টিকে আমরা একটি

সার্থক বাক্য হিসাবে অভিহিত করতে পারি। একটি সার্থক বাক্যে তিনটি গুণ থাকা অত্যাৱশ্যক। যথা : (১) আকাঙ্ক্ষা, (২) আসত্তি ও (৩) যোগ্যতা।

আকাঙ্ক্ষা : বাক্যের অর্থ পরিস্কার এবং সুস্পষ্টভাবে জানার জন্য একটি শব্দ বা পদের পরে অপর পদ শুনায় যে ইচ্ছা বা স্পৃহা অর্থাৎ রুচি তাই হলো বাক্যের আকাঙ্ক্ষা। যথা- রাঙাচানে বাজারত.....। বাক্যটিতে মনের ভাব পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হতে পারে নি। যদি বলা হতো “রাঙাচানে বাজারত যার”। তাহলে মনের ভাব পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পেতো। অর্থাৎ তখন আর অতিরিক্ত কিছু শুনায় ইচ্ছা বা রুচি থাকতো না। সে কারণে ইহা বিশেষভাবে জানা থাকতে হবে যে, আকাঙ্ক্ষার শেষ না হওয়া পর্যন্ত পূণাজ বাক্য গঠিত হয় না।

আসত্তি বা নৈকট্য : মনের ভাব পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করবার জন্য শব্দ বা পদসমষ্টিকে সুশৃঙ্খলভাবে রীতি পরম্পরাভাবে সাজাতে হয়। যেহেতু ধ্বনি বিন্যাসে সূত্রাশ্রয়ী রীতি না মানা হলে যেমন অর্থ প্রকাশে বিভ্রাট ঘটে; তদ্রূপ বাক্যের অর্থজ্ঞাপক শব্দসমষ্টিকে যথার্থভাবে বিন্যস্ত না করা হলেও ভাব প্রকাশে বিপত্তির উদ্ভব ঘটে থাকে। তাই আমরা নির্দিষ্টায় বলতে পারি বাক্যের অর্থ সঙ্গতিপূর্ণ পদ বিন্যাসই একটি সার্থক বাক্যের আসত্তি বা পরম্পর অস্থিত পদসমূহের সন্নিহিত অবস্থান। যথা- যদি বলা হয় “পানি লামুনি ছড়া যার”। তাহলে দেখা যাবে অর্থজ্ঞাপক শব্দ বা পদসমষ্টির অসঙ্গতিপূর্ণ পদবিন্যাসের কারণে বাক্যটি সার্থক বাক্য হতে পারেনি। কারণ পানি লামুনি কখনও ছড়া যায় না। যদি বলা হতো ছড়া লামুনি পানি যার। তাহলে তাতে অবধারিত সত্যটি প্রকাশে কোনোরূপ বাঁধা সৃষ্টি হতো না। যার ফলে বাক্যটিও সার্থক বাক্য হিসাবে পরিগণিত হতো। আর তাহাই হবে বাক্যের আসত্তি বা অর্থজ্ঞাপক শব্দ বা পদগুলির অর্থসঙ্গতিপূর্ণ নৈকট্য সাধন।

যোগ্যতা : বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির অর্থ এবং ভাবগত মেলবন্ধনই হলো বাক্যের যোগ্যতা। যদি বলি “উন্দুরবুয়য় গাড়ী চালার”। তাহলে বাক্যান্তর্গত অর্থজ্ঞাপক শব্দগুলির সঙ্গতিবিহীন বিন্যাসের কারণে বাক্যটি যোগ্যতা সম্পন্ন বাক্য হতে পারে নি। যেহেতু ইদুর গাড়ী চালাতে পারে না। তাতে বরং ইহা বুঝা যায় বাক্যে ব্যবহৃত পদসমূহের অর্থ এবং পারম্পরিক ভাবগত যোগ্যতা নেই। তবে যদি বলা যায় “উন্দুরবুয় তঝকখান কামড়ার”। তাহলে বাক্যান্তর্গত অর্থবোধক শব্দগুলির একটি অর্থগত মিল পাওয়া যেত। আর ঐ রকম সঙ্গতিপূর্ণ অর্থ ও ভাবগত মিলনযুক্ততা হলো

প্রকৃত যোগ্যতা সম্পন্ন সার্থক বাক্য।

বাক্যের শ্রেণীবিভাগ : চাকমা ভাষার বাক্যগুলিকে গঠন প্রকৃতি অনুসারে এবং অর্থ অনুসারে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (১) গঠন অনুসারে, (২) ভাবভঙ্গি বা অর্থানুসারে।

(১) গঠন অনুসারে : বাক্যের গঠন প্রকৃতি আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক) সরল বাক্য, খ) জটিল বা মিশ্র বাক্য এবং যৌগিক বাক্য।

ক) সরল বাক্য : যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যথা- উভচুলঃ গুরু চড়ায়। উক্ত বাক্যের উভচুলঃ কর্তা বা বাক্যের ক্রিয়া সম্পাদনের ভিত্তি অর্থাৎ বাক্যের উদ্দেশ্য এবং গুরু চড়ায়' একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া বা বাক্যটির চূড়ান্ত ভাব প্রকাশিত বিধেয়।

খ) জটিল বা মিশ্র বাক্য : যে বাক্যে একটি প্রধান খন্ড বাক্যের এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পরসাপেক্ষ বা মূল বাক্যের উপর নির্ভরশীলভাবে ব্যবহৃত হয় সে সব বাক্যকে জটিল বা মিশ্র বাক্য বলে। যথা- “ যে মদে মাস্তুল অয় তে পাগলঃ ঢক কথা কয়”। উক্ত বাক্যে ‘যে মদে মাস্তুল অয়’ হলো প্রধান খন্ডবাক্য এবং ‘তে পাগল ঢক কথা কয়’ হলো প্রধান খন্ডবাক্যের আশ্রিত বাক্য। আর উভয়ে মিলেই একটি সম্পূর্ণ জটিল বা মিশ্রবাক্য গঠিত হয়েছে।

গ) যৌগিক বাক্য : পরস্পর নিরপেক্ষ বা স্বাধীন বা পক্ষপাতহীন দুই বা ততোধিক সরল বা জটিল বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যথা- “ঢাকবাটি বিদ্বান অ'লেয়' ভদ্রতা নজানে”। উক্ত বাক্যে ‘ঢাকবাটি’ বিদ্বান অলেয়' প্রধান সরল বাক্য এবং ‘ভদ্রতা নজানে’ মিলিত অপর একটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সরল বাক্য। কিন্তু দ্বিতীয় নিরপেক্ষ সরল বাক্য ‘ভদ্রতা নজানে’ বাক্যটির বিষয়বস্তু প্রথমটির অর্থাৎ ঢাকবাটি বিদ্বান অলেয়' এর অন্তর্গত।

জেনে রাখার বিষয় হলো, যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত সরল বা জটিল বাক্যগুলো পরস্পর মাস্তুর, খানিক, আ, অলেয় ইত্যাদি অব্যয় যোগে সংযুক্ত বা সমন্বিত হয়ে থাকে।

(২) স্বরভঙ্গি বা ভাবভঙ্গি বা অর্থানুসারে বাক্যের ভাবভঙ্গি বা অর্থানুসারে আবার বাক্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা ক) বিবৃতিমূলক, খ) প্রশ্নবাচক, গ) অনুজ্ঞা বা আদেশ-অনুমতি ও সম্মতিবাচক, ঘ) ইচ্ছাবোধক এবং ঙ) বিস্ময়সূচক।

ক) বিবৃতিমূলক : যে বাক্যে কোনো ঘটনা বা ভাবের বিবরণীমাত্র থাকে, তাকে বিবৃতিমূলক বাক্য বলে। যথা- ফগনা নিজ ঘরত থায়।

খ) প্রশ্নবাচক : যে বাক্যে জিজ্ঞাসা করা হয়ে থাকে বা প্রশ্নমাত্র বুঝায় তাকে প্রশ্নবাচক বাক্য বলে। যথা- কান্দারা কেয়ান আঘচ?

গ) অনুজ্ঞাবাচক বা আদেশ, অনুমতি ও সম্মতিসূচক : যে বাক্যে কোনো আদেশ, উপদেশ, নিষেধ এবং অনুরোধ করা প্রকাশ পায় তাকে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য বলে। যথা- মিঝা কথা ন কভে।

ঘ) ইচ্ছাবোধক বাক্য : যে বাক্যে কোনো শুভেচ্ছা, আশীর্বাদ, প্রার্থনা, ইচ্ছা ইত্যাদি প্রকাশ পায় তাকে ইচ্ছাবোধক বাক্য বলে। যথা- সাধু সাধু পাক্কাই এক্ষেরে বঝরঃ ভাদে পারিদে ভিলে।

ঙ) বিস্ময়সূচক বাক্য : যে বাক্যে কোনো হর্ষ অর্থাৎ আনন্দ, পুলক, শিহরণ (লোমহর্ষক), বিষাদ, দুঃখ-বেদনা, আবেগ ইত্যাদি প্রকাশ পায় তাকে বিস্ময়সূচক বাক্য বলে। যথা- কি ডোল, গদা খুয়াঙুয় ইত্যাদি।

#

লেখক পরিচিতি

□ নাম : প্রিয়দর্শী খীসা

□ জন্ম : ১লা জুলাই ১৯৪৬ খ্রি.

□ কর্মক্ষেত্র : প্রিভেন্টিভ অফিসার, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম
(অবসর- ১লা জুলাই ২০০৩ খ্রি.)

□ রচিত গ্রন্থের সংখ্যা : এটি অষ্টাদশ ক্রম

□ সম্মাননা প্রাপ্তি :

(১) বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল হতে ১০ই এপ্রিল ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে সাহিত্য সম্মাননা প্রাপ্ত হন। সম্মাননা পদক ও সনদ হাতে তুলে দেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা।

(২) পিস ওয়ার্ল্ড, ঢাকা, “নেলসন ম্যান্ডেলা সাইনিং এ্যাওয়ার্ড-২০১৩ খ্রি. সাহিত্য সম্মাননা প্রাপ্ত হন ৬ই মে, ২০১৪ তারিখে। সম্মাননা পদক ও সনদ পত্র হাতে তুলে দেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী জনাব, আ ক ম মোজাম্মেল হক, এমপি।